কথা বলার জন্য কারাদণ্ড যেভাবে গণতন্ত্র ধ্বংস করেছে!

বাংলাদেশের প্রস্তাবিত সাইবার সুরক্ষা (সংশোধন) আইন, ২০২৭: সমস্যা ও করণীয়

(একটি ঐতিহাসিক পর্যালোচনা, পিয়ার-রিভিউড জার্নাল বেজড)

মানহানি, রাষ্ট্রদ্রোহ এবং "ভুয়া সংবাদ" আইন ফৌজদারি শাস্তিতে রূপ নিলে কীভাবে তা গণতন্ত্রের জন্য ক্ষতিকর হতে পারে এবং কেন বাক্-অপরাধের শাস্তি কেবল জরিমানাই হওয়া উচিত

গবেষণা প্রতিবেদন

মুসা ইবনে মান্নান

পিএইচডি গবেষক, ইউটিডি, ডালাস, যুক্তরাষ্ট্র

('কিশোর পাশা ইমন' ছদ্মনামে ২৬ টি বইয়ের রচয়িতা, বাংলাদেশ ও ভারতে প্রকাশিত)

নভেম্বর ২০২৬

দ্য ইউনিভার্সিটি অব টেক্সাস অ্যাট ডালাসের ইউজিন ম্যাকডারমট লাইব্রেরির মাধ্যমে সংগৃহীত পিয়ার-রিভিউড জার্নাল পেপার এবং উন্মুক্ত ওয়েব থেকে সংগৃহীত আইনি ভাষ্য, আদালতের রায় এবং চলমান মামলার প্রতিবেদন থেকে একটি গবেষণাপত্র

একটি 'আগে বাংলাদেশ' প্রচেষ্টা (ওয়েবসাইট : www.aagebangladesh.org)

সূচিপত্র

সারসংক্ষেপ ১
১. পরিধি, পরিভাষা ও পদ্ধতি ২
১.১ এখানে “বাক্-অপরাধ” বলতে কী বোঝানো হয়েছে ২
১.২ “ফেলনি পর্যায়” বা ফৌজদারি অপরাধ ২
১.৩ উৎস ও পদ্ধতি ২
২. কঠোরতা বৃদ্ধির ঐতিহাসিক দলিল ৩
২.১ মধ্যযুগীয় ও প্রাক্-আধুনিক ইংল্যান্ড: “ম্যাগনেট” বা অভিজাতদের সুরক্ষা ৩
২.২ ঔপনিবেশিক আমেরিকা এবং প্রারম্ভিক যুক্তরাষ্ট্র ৩
২.৩ ঔপনিবেশিক ভারত: শাসনের কৌশল হিসেবে রাষ্ট্রদ্রোহ ৩
২.৪ দুই বিশ্বযুদ্ধের মধ্যবর্তী কাল: গণতন্ত্র ও একনায়কতন্ত্রের মিলনবিন্দু ৪
২.৫ যুদ্ধকালীন আমেরিকা: এসপিওনাজ ও সিডিশন অ্যাক্টস ৪
২.৬ ফৌজদারি মানহানি যা কখনোই বিদায় নেয়নি: যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডা ৪
২.৭ ডিজিটাল মোড়: সাইবার অপরাধ যখন ঝুঁকির মাত্রা বাড়িয়ে দেয় ৪
২.৮ “ভুয়া সংবাদ”-এর ঢেউ, ২০১৮ থেকে ২০২৬ ..... ৫
২.৯ কঠোরতা বৃদ্ধির রেকর্ডের সারসংক্ষেপ ৬
৩. কঠোরতা কীভাবে বৃদ্ধি পায়: পৌনঃপুনিক কৌশলসমূহ ৮
৩.১ অস্পষ্ট সংজ্ঞা বিচারের ভার প্রয়োগকারীর হাতে তুলে দেয় ৮
৩.২ শাস্তির র‍্যাচেট বা ক্রমবর্ধমান কঠোরতা ৮
৩.৩ বিচারিক প্রক্রিয়াই যখন শাস্তি ৮
৩.৪ বেসরকারি বা বহিরাগতদের হাতে আইন প্রয়োগের ভার অর্পণ ৮
৩.৫ জম্বি আইন এবং হাতবদল হওয়া আইন ৮
৪. মূল যুক্তি: বাক্-অপরাধে কখনোই কারাদণ্ড বা ফেলনি মর্যাদা থাকা উচিত নয় ৯
৪.১ সম্ভাব্য সবচেয়ে নিকৃষ্ট সরকারের কথা মাথায় রেখে আইন প্রণয়ন করুন ৯
৪.২ বাক্-সংক্রান্ত মামলায় রাষ্ট্র এমন এক বিরোধের বিচার করে যেখানে সে নিজেই একটি পক্ষ ৯
৪.৩ শাস্তির কঠোরতার সাথে পাল্লা দিয়ে ভীতিজনিত নীরবতা (সেলফ সেন্সরশিপ) বৃদ্ধি পায় ৯
৪.৪ আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আইন ইতোমধ্যে এই পথই নির্দেশ করে ৯
৪.৫ দেওয়ানি ও প্রশাসনিক প্রতিকার ইতোমধ্যে বিদ্যমান ১০
৪.৬ কারাদণ্ড তথ্যগত সমস্যার সমাধান করে না ১০
৫. মানহানি ও ভুল তথ্যের জন্য কেবল-জরিমানা মডেল ১১
৫.১ বাংলাদেশের প্রস্তাবিত সাইবার সুরক্ষা (সংশোধন) আইন, ২০২৭: সমস্যা ও করণীয় ১২
৬. পাল্টা যুক্তি ও প্রত্যুত্তর ১৫
৬.১ ফৌজদারি মানহানি প্রধানত সাধারণ মানুষকে রক্ষা করে ১৫
৬.২ মর্যাদা হিসেবে সুনাম ফৌজদারি সুরক্ষার দাবি রাখে ১৫
৬.৩ কিছু মিথ্যাচার প্রাণঘাতী ১৫
৬.৪ জরিমানা ক্ষমতাশালীদের নিবৃত্ত করে না, আবার জরিমানাও ভীতিজনিত নীরবতা তৈরি করতে পারে ১৫
৬.৫ শক্তিশালী আদালতযুক্ত গণতন্ত্রের ওপর আস্থা রাখা যায় ১৬
৭. সংক্ষেপে প্রস্তাবিত পরিবর্তনসমূহ ১৭
৮. উপসংহার ১৯
তথ্যসূত্র ২০
পিয়ার-রিভিউড প্রবন্ধসমূহ ২০
আইনি দলিল ও আদালতের রায়সমূহ ২১
সাম্প্রতিক ঘটনাবলির প্রতিবেদন ও সংবাদ উৎস ২২

সারসংক্ষেপ

গত ৭০০ বছরেরও বেশি সময় ধরে বিশ্বের বিভিন্ন সরকার এমন সব শব্দের জন্য মানুষকে শাস্তি দিয়ে আসছে যেগুলোকে মিথ্যা, কুৎসামূলক অথবা কর্মকর্তা ও রাষ্ট্রের সুনামের (reputation) জন্য ক্ষতিকর বলে অভিহিত করা হয়েছে। সময়ের সাথে তকমাগুলো বদলেছে (স্ক্যান্ডালাম ম্যাগনাটাম, রাষ্ট্রদ্রোহমূলক কুৎসা (seditious libel), রাষ্ট্রদ্রোহ, ফৌজদারি মানহানি (criminal defamation), "আক্রমণাত্মক বার্তা", "ভুয়া সংবাদ", "অপতথ্য (disinformation)"), এবং কৌশলটি এতটাই আগের মতো রয়েছে যে দেখলেই চেনা যায়। ঘটনাটি অনেকটা এমন ঘটে- যথাযথ কারণসহই জনশৃঙ্খলা বা সত্যের নামে একটি ধোয়াচ্ছন্ন ভাষায় সংজ্ঞায়িত অপরাধ তৈরি করা হয়, এতে কারাদণ্ডের বিধান রাখা হয়, এবং এরপর যে-ই ক্ষমতায় থাকুক না কেন তার সমালোচকদের বিরুদ্ধেই এটি সবচেয়ে বেশি ব্যবহার করা হয়।

এই প্রতিবেদনে মধ্যযুগীয় ইংল্যান্ড থেকে শুরু করে ১৭৯৮ সালের আমেরিকান সিডিশন অ্যাক্ট, ঔপনিবেশিক ভারত, প্রথম বিশ্বযুদ্ধ এবং ডিজিটাল যুগে বাংলাদেশ, ভারত, ফিলিপাইন, নাইজেরিয়া, মালয়েশিয়া, সিঙ্গাপুর, হাঙ্গেরি, রাশিয়া, তুরস্ক ও পাকিস্তানে সাইবার-মানহানি ও "ভুয়া সংবাদ" আইনের ঢেউ পর্যন্ত সেই ইতিহাস অনুসন্ধান করা হয়েছে। এসব ঘটনার মধ্য দিয়ে কঠোরতা বৃদ্ধির পাঁচটি পৌনঃপুনিক বৈশিষ্ট্য ফুটে ওঠে: অস্পষ্ট (vague) সংজ্ঞা, শাস্তির ক্রমবর্ধমান কঠোরতা (প্রায়ই যখন বক্তব্য অনলাইনে স্থানান্তরিত হয়), গ্রেপ্তার ও জামিন নামঞ্জুরের মাধ্যমে বিচারিক প্রক্রিয়াকেই শাস্তি হিসেবে ব্যবহার করা (নির্দোষ এখানে অনায়াসে কয়েক সপ্তাহ থেকে কয়েক মাস জেল খেটে ফেলতে পারে, তারপর তাকে ছেড়ে দেয়া হলেও তার নাগরিক অধিকার ক্ষুণ্নের জন্য বড় অঙ্কের টাকার ক্ষতিপূরণ (damages) সরকার দেয় না), ক্ষমতার সাথে যুক্ত বেসরকারি অভিযোগকারীদের হাতে আইন প্রয়োগের দায়িত্ব ছেড়ে দেওয়া, এবং এমন সব আইন যা সেগুলো প্রণয়নকারী সরকারের পতনের পরও টিকে থাকে এবং তার প্রতিদ্বন্দ্বীদের হাতে চলে যায়।

এই ঐতিহাসিক রেকর্ডের ভিত্তিতে প্রতিবেদনটি যুক্তি দেয় যে অসত্যতা (falsity), মানহানি বা "ভুল তথ্য (misinformation)"-এর ওপর ভিত্তি করে গঠিত বাক্-অপরাধে (speech offence) কখনোই কারাদণ্ড বা 'ফৌজদারি' কিংবা 'ফেলনি' মর্যাদা থাকা উচিত নয়। এর মূল কারণটি প্রাতিষ্ঠানিক: বাক্-সংক্রান্ত আইন প্রণয়নকারী কোনো আইনসভার ধরে নেওয়া উচিত যে তার কল্পনাযোগ্য সবচেয়ে নিকৃষ্ট সরকারই একদিন এই আইন প্রয়োগ করবে।

যে আইন কেবল জরিমানা করতে পারে, তা ব্যবহার করে কোনো সাংবাদিক, বিরোধী রাজনীতিক বা কর্মীকে জনজীবন থেকে সরিয়ে দেওয়া যায় না এবং সেটিকে অনির্দিষ্টকালের প্রাক্-বিচার আটকাবস্থায় রূপান্তরিত করা যায় না। প্রতিবেদনটি সুরক্ষাকবচসহ একটি কেবল-জরিমানা মডেল (fines-only model) প্রস্তাব করে (আয়-অনুপাতে ও সর্বোচ্চ সীমা-নির্ধারিত জরিমানা, জরিমানা অনাদায়ে কারাদণ্ড না থাকা, সত্যতা ও জনস্বার্থের (public interest) আত্মপক্ষ সমর্থন, একজন স্বাধীন নিষ্পত্তিকারী (adjudicator), এবং শাস্তির আগে সংশোধন), এবং প্রকৃত হুমকি (true threats), আসন্ন সহিংসতায় উসকানি (incitement) ও প্রতারণার মতো সত্যিকারের বিপজ্জনক আচরণগুলোকে সেসব পৃথক ফৌজদারি আইনের অধীনেই রাখে যা ইতোমধ্যে সেগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করে।

পিয়ার-রিভিউড সাহিত্যে পাওয়া সবচেয়ে শক্তিশালী পাল্টা যুক্তিগুলো আলোচনার মাধ্যমে প্রতিবেদনটি শেষ হয়েছে, যার মধ্যে রয়েছে এমন প্রমাণ যে কিছু বিচারব্যবস্থায় ফৌজদারি মানহানি প্রধানত ব্যক্তিগত নাগরিকদের হয়রানি থেকে রক্ষা করতে ব্যবহৃত হয়, এবং এই যুক্তি যে কেবল জরিমানা ধনী বা রাষ্ট্র-সমর্থিত কুশীলবদের নিবৃত্ত করতে যথেষ্ট নাও হতে পারে। তবে একজন মানুষের একটি সেকেন্ডও সরকারি বন্দিদশায় কেড়ে নেয়ার যে গুরুতর ক্ষতি, তা একশ'জন ধনী ব্যক্তির পয়সা ঢেলে ডিস-ইনফরমেশন ছড়িয়েও পার পেয়ে যাওয়ার থেকে বেশি।

১. পরিধি, পরিভাষা ও পদ্ধতি

১.১ এখানে "বাক্-অপরাধ" বলতে কী বোঝানো হয়েছে

এই প্রতিবেদনে সেসব ফৌজদারি আইন অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে যা কোনো অভিব্যক্তিকে মিথ্যা, মানহানিকর, কর্মকর্তা বা প্রতিষ্ঠানের প্রতি অবমাননাকর, অথবা "আতঙ্ক", "বিশৃঙ্খলা" সৃষ্টি বা রাষ্ট্রের "ভাবমূর্তি" ক্ষুণ্ন করার আশঙ্কাজনক হওয়ার অজুহাতে শাস্তি দেয়। প্রতিবেদনটি এগুলোকে চারটি বর্গে ভাগ করেছে:

- **রাষ্ট্রদ্রোহমূলক কুৎসা ও রাষ্ট্রদ্রোহ:** সরকার বা তার কর্মকর্তাদের সমালোচনাকে রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে অপরাধ হিসেবে গণ্য করা।
- **ফৌজদারি মানহানি ও অবমাননা:** কোনো ব্যক্তির সুনামের ক্ষতি করা, যেখানে কর্মকর্তাদের ক্ষেত্রে প্রায়শই আরও কঠোর বিধান থাকে।
- **সাইবার ও "আক্রমণাত্মক বার্তা" সংক্রান্ত বিধান:** ইলেকট্রনিক যোগাযোগের সাথে যুক্ত অপরাধ, যা প্রায়ই মানহানি বা জনশৃঙ্খলা সংক্রান্ত অপরাধগুলোকে আরও কঠোর শাস্তিসহ অনুকরণ করে।
- **ভুয়া সংবাদ, ভুল তথ্য ও অপতথ্য সংক্রান্ত অপরাধ:** এমন সব বক্তব্যের জন্য শাস্তি যা কোনো আদালত বা কর্মকর্তা মিথ্যা এবং জনশৃঙ্খলা, স্বাস্থ্য, নিরাপত্তা বা সশস্ত্র বাহিনীর জন্য ক্ষতিকর বলে ঘোষণা করে।

এই প্রতিবেদন প্রকৃত হুমকি, যেমন আসন্ন সহিংসতায় উসকানি, প্রতারণা, চাঁদাবাজি, শিশু যৌন নির্যাতনমূলক উপাদান, অথবা নাগরিকের পিছু নেওয়া সহজতর করে এমন ডক্সিংয়ের বিরুদ্ধে বিদ্যমান আইনগুলো বিলোপের পক্ষে যুক্তি দিচ্ছে না। ওই অপরাধগুলো ক্ষতি বা কাজের দ্বারা সংজ্ঞায়িত, এবং জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে কোনো মতামত "সত্য" ছিল কি না সে বিষয়ে আদালতকে রায় দিতে না বলেই সেগুলো প্রয়োগ করা যায়।

১.২ "ফেলনি পর্যায়" বা ফৌজদারি অপরাধ

"ফেলনি" হলো কমন-ল বা সাধারণ আইনের একটি বর্গ (যুক্তরাষ্ট্রে এক বছরের বেশি কারাদণ্ডে দণ্ডনীয় অপরাধ)। আলোচিত দেশগুলোর বেশিরভাগই অন্য শ্রেণিবিন্যাস ব্যবহার করে, যেমন দক্ষিণ এশীয় আইনে আমলযোগ্য (cognizable) ও অজামিনযোগ্য (non-bailable) অপরাধ অথবা রুশ আইনে "গুরুতর" অপরাধ। তাই এই প্রতিবেদনে কোনো বাক্-অপরাধকে ফেলনি পর্যায়ের বলে গণ্য করা হয়েছে যখন তাতে এক বছরের বেশি কারাদণ্ডের বিধান থাকে, অথবা যখন তা পরোয়ানা ছাড়া গ্রেপ্তার এবং অধিকার হিসেবে জামিন ছাড়াই আটক রাখার অনুমতি দেয়।

(এই গবেষণাপত্র অবশ্য ফৌজদারি অপরাধ ছাড়াও শুধুমাত্র যে কোন মাত্রায় গ্রেফতারের বিষয়টাও বিবেচনায় রেখেছে। বাংলাদেশের বর্তমান সাইবার সুরক্ষা আইনের খসড়া যদি ৩ দিনের কিংবা ৩ ঘণ্টার জন্যও কাউকে গ্রেফতার করতে চায়, সেটি কীভাবে ভয়ানকভাবে গণতন্ত্রকে ধ্বংস করতে পারে তাও এখানে বিবেচ্য।)

১.৩ উৎস ও পদ্ধতি

পিয়ার-রিভিউড জার্নাল প্রবন্ধগুলো ইউটি ডালাস লাইব্রেরি ডিসকভারি সিস্টেম (প্রিমো, পিয়ার-রিভিউড আধেয়তে ফিল্টারকৃত)-এর মাধ্যমে ফৌজদারি মানহানি, রাষ্ট্রদ্রোহমূলক কুৎসা, ভারতে রাষ্ট্রদ্রোহ, ভুয়া সংবাদের অপরাধীকরণ, বাংলাদেশের ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন, রাশিয়ার যুদ্ধ-সংক্রান্ত "ভুয়া সংবাদ" আইন, তুরস্কের অপতথ্য আইন, নাইজেরিয়ার সাইবারক্রাইম অ্যাক্ট, ফিলিপাইনের সাইবার-মানহানি, কোভিড-যুগের ভুল তথ্য আইন এবং ভীতিজনিত নীরবতার প্রভাব বিষয়ে অনুসন্ধানের মাধ্যমে খুঁজে বের করা হয়েছে। প্রাথমিক আইনি উৎস (জাতিসংঘ মানবাধিকার কমিটির সাধারণ মন্তব্য নং ৩৪ (General Comment No. 34), আদালতের রায়) এবং সংবাদ সংস্থা ও গণমাধ্যম-স্বাধীনতা বিষয়ক এনজিওগুলোর সাম্প্রতিক মামলার প্রতিবেদনগুলো এমন সব ঘটনা পূরণ করেছে যা পিয়ার-রিভিউড সাহিত্যে এখনো আসেনি, বিশেষ করে ২০২৩ থেকে ২০২৬ সাল পর্যন্ত। পাঠক যেন দেখতে পান কোন দাবিগুলো পিয়ার-রিভিউড গবেষণার ওপর প্রতিষ্ঠিত, সেজন্য তথ্যসূত্রের তালিকায় এই বর্গগুলোকে আলাদা রাখা হয়েছে।

ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে একটি সীমাবদ্ধতা গুরুত্বপূর্ণ: সাম্প্রতিক উপাত্তের একটি বড় অংশ সংগৃহীত হয়েছে গণমাধ্যম-স্বাধীনতা বিষয়ক সংগঠনগুলো থেকে, যাদের উদ্দেশ্য হলো অ্যাডভোকেসি বা অধিকারের পক্ষে কথা বলা। এসব গোষ্ঠীর মামলার সংখ্যাগুলো মাত্রার ধারণা পাওয়ার জন্য কার্যকর, এবং যেখানে উৎসগুলোর মধ্যে মতভেদ রয়েছে সেখানে প্রতিবেদনটি একক কোনো সংখ্যার ওপর নির্ভর করা এড়িয়ে চলেছে।

২. কঠোরতা বৃদ্ধির ঐতিহাসিক দলিল

২.১ মধ্যযুগীয় ও প্রাক্-আধুনিক ইংল্যান্ড: "ম্যাগনেট" বা অভিজাতদের সুরক্ষা

ইংল্যান্ডের স্ক্যান্ডালাম ম্যাগনাটাম (১২৭৫) সংবিধিতে রাজ্যের মহান বা অভিজাত ব্যক্তিদের সম্পর্কে মিথ্যা সংবাদ বা কাহিনি ছড়ানোকে অপরাধ হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছিল। লিলিয়েনথাল এবং আহমাদ (২০১৮) পরবর্তীকালের রাষ্ট্রদ্রোহ (sedition) আইনকে এই ধারণারই বংশধর হিসেবে পাঠ করেছেন: এটি এমন এক অপরাধ যা সুনির্দিষ্ট ক্ষতি রোধ করার চেয়ে শাসক শ্রেণির সুনাম ও প্রশাসনিক পদ্ধতিগুলোকে জনসমক্ষে উন্মোচিত হওয়া থেকে রক্ষা করার জন্যই বেশি তৈরি করা হয়েছিল। সপ্তদশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে কোর্ট অব স্টার চেম্বার রাষ্ট্রদ্রোহমূলক কুৎসা মতবাদটি গড়ে তোলে, এবং স্টার চেম্বার বিলুপ্ত হওয়ার পর এই মতবাদ কমন-ল আদালতগুলোতে স্থানান্তরিত হয়। এই সময়ের বেশিরভাগ জুড়েই সত্যতা কোনো আত্মপক্ষ সমর্থনের যুক্তি ছিল না; বরং কর্তৃপক্ষের কাছে মিথ্যা সমালোচনার চেয়ে সত্য সমালোচনা আরও বেশি বিপজ্জনক হতে পারত। ১৮৪৩ সালের লাইবেল অ্যাক্টের মাধ্যমেই কেবল ইংরেজ ফৌজদারি মানহানি আইনে সত্যতাকে আত্মপক্ষ সমর্থনের যুক্তি হিসেবে গ্রহণযোগ্য করা হয়।

অষ্টাদশ শতাব্দীর ইতিহাসবিদরা দেখান যে এই অপরাধের পরিধি কতটা বিধ্বংসী এবং ভয়ঙ্কর ছিল। হান্ট (২০১৭) প্রামাণ্য দলিলের মাধ্যমে দেখিয়েছেন যে রাষ্ট্রদ্রোহমূলক কুৎসার মামলা যারা ওই লেখাটি ছাপালো (প্রিন্টার) তাদের ঘরের চাকরবাকর কিংবা শিক্ষানবিশদের পর্যন্ত অপরাধীর কাতারে তুলে ফেলেছিল, অথচ ওসব কন্টেন্টের ওপর এই বেচারাদের আদতে কোন নিয়ন্ত্রণ ছিল না। অর্থাৎ একবার এ ধরনের আইন করে ফেলা হলে এটা যে কারো জীবন ধ্বংস করে ফেলতে পারে।

রাশটন (২০১৫) ১৬৫০ থেকে ১৭৫০ সালের মধ্যে সরাইখানা ও রাস্তায় উচ্চারিত "রাষ্ট্রদ্রোহমূলক কথা"-র জন্য দায়েরকৃত মামলাগুলোর ইতিহাস অনুসন্ধান করেছেন। পেজ (২০০৯) ১৭৮০-এর দশকে ডিন অব সেন্ট আসাফের বিচারের বর্ণনা দিয়েছেন, এই ট্রায়ালে মূল লড়াইটি ছিল কোনো প্রকাশনা অপরাধমূলক কি না তা জুরি নাকি বিচারক নির্ধারণ করবেন তা নিয়ে।

২.২ ঔপনিবেশিক আমেরিকা এবং প্রারম্ভিক যুক্তরাষ্ট্র

নেলসন (১৯৫৯) দেখান যে রাষ্ট্রদ্রোহমূলক কুৎসা (যা বর্তমান সাইবার সুরক্ষা আইনের 'হেয়প্রতিপন্ন করা' কিংবা 'রাষ্ট্রের মর্যাদা' ধরনের একটি আইন) ইংরেজ আইনের সাথে আটলান্টিক পাড়ি দিয়েছিল এবং ঔপনিবেশিক কর্তৃপক্ষ প্রকাশকদের বিরুদ্ধে তা ব্যবহার করত। এরপর স্বাধীন যুক্তরাষ্ট্র সংবিধানের প্রথম সংশোধনী অনুমোদনের (ফার্স্ট অ্যামেন্ডমেন্ড, যা বাকস্বাধীনতার অধিকার, এবং বিশ্বব্যাপী জনপ্রিয়) এক দশকের মধ্যেই কথা বলার ওসব উদাহরণকে অপরাধ বলে সংজ্ঞায়িত করে ফেলে।

ফ্রান্সের সাথে যুদ্ধভীতির সময় ফেডারেলিস্ট কংগ্রেস কর্তৃক পাস হওয়া ১৭৯৮ সালের সিডিশন অ্যাক্টে সরকার, কংগ্রেস বা প্রেসিডেন্টের বিরুদ্ধে "মিথ্যা, কুৎসামূলক ও বিদ্বেষপূর্ণ" লেখা প্রকাশ করাকে অপরাধ হিসেবে ঘোষণা করা হয়। জেনকিন্স (২০০১) যুক্তি দেন যে এই আইন এবং একে ঘিরে তৈরি হওয়া বিতর্কই নির্ধারণ করে দিয়েছিল কীভাবে রাষ্ট্রদ্রোহমূলক কুৎসা প্রথম সংশোধনীর মতবাদে প্রথমবারের মতো ঢুকেছিল এবং পরবর্তীতে প্রত্যাখ্যাত হয়েছিল। ও না হলে আমেরিকার বর্তমান বাকস্বাধীনতা থাকতো না, এবং লক্ষণীয় হচ্ছে, কুৎসা রটানোর অধিকার মানুষকে (ভালো এবং খারাপ উদ্দেশ্যের মানুষকে) দিতে হবে, নইলে বাকস্বাধীনতা থাকবে না, তা আমেরিকার 'ফার্স্ট অ্যামেন্ডমেন্ড'কে বিবেচনা করতে হয়েছিল এবং স্বীকৃতি দিতে হয়েছিল।

এই আইন প্রয়োগের ধরনটি শিক্ষণীয়। প্রথম যে ব্যক্তির বিচার করা হয়েছিল তিনি হলেন ম্যাথিউ লায়ন, ভারমন্টের একজন কর্মরত বিরোধী দলীয় কংগ্রেস সদস্য, যাকে ১,০০০ ডলার জরিমানা ও চার মাসের কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছিল এবং জরিমানা পরিশোধ না করা পর্যন্ত কারাদণ্ডের মেয়াদ শেষেও যাকে মুক্তি দেওয়া হয়নি। রিপাবলিকান প্রচারপত্র লেখক জেমস ক্যালেন্ডারকে নয় মাসের কারাদণ্ড ও ২০০ ডলার জরিমানা করা হয়। ওয়েন্ডেল বার্ডের মহাফেজখানাভিত্তিক গবেষণা, যা একাধিক পিয়ার-রিভিউড ইতিহাস জার্নালে পর্যালোচিত হয়েছে (মেইউ, ২০২১; কানস্ট্রুম, ২০২০; রাকোভ, ২০২২), প্রচলিত হিসাবের চেয়ে অনেক বেশি মামলার সন্ধান পেয়েছে, যার প্রায় সবগুলোই ছিল বিরোধী ডেমোক্রেটিক-রিপাবলিকান পার্টির সমর্থকদের বিরুদ্ধে।

১৮০১ সালের মার্চে, যে প্রশাসন আইনটি প্রণয়ন করেছিল তার শেষ দিনে, আইনটির মেয়াদ শেষ হয় এবং বর্তমানে এটি ব্যাপকভাবে একটি সাংবিধানিক লজ্জা হিসেবে বিবেচিত। সমালোচকরা ঠিক যেমনটি ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন আইনটি ঠিক সেভাবেই কাজ করেছিল: নির্বাচনের মুখোমুখি ক্ষমতাসীন দলের একটি হাতিয়ার হিসেবে।

২.৩ ঔপনিবেশিক ভারত: শাসনের কৌশল হিসেবে রাষ্ট্রদ্রোহ

১৮৭০ সালে ভারতীয় দণ্ডবিধিতে ১২৪এ ধারা যুক্ত করা হয় এবং এটি জাতীয়তাবাদী সংবাদমাধ্যমের বিরুদ্ধে ঔপনিবেশিক সরকারের প্রধান হাতিয়ারে পরিণত হয়। লিলিয়েনথাল এবং আহমাদ (২০১৮) এটিকে মূলত নিপীড়নের উদ্দেশ্যে উদ্ভাবিত একটি বিধান হিসেবে বর্ণনা করেছেন, এবং যাদব (২০২৩) এর দ্ব্যর্থবোধক ভাষা, স্বাধীনতার পর এর টিকে থাকা এবং যুক্তরাজ্য ও যুক্তরাষ্ট্রের তুলনামূলক বিকাশের ইতিহাস তুলে ধরেছেন। লিওনার্ড (২০২৪) দেখান যে অষ্টাদশ শতাব্দীর সেই একই ইংরেজ রাষ্ট্রদ্রোহমূলক কুৎসার নজিরগুলো ১৯৫০-এর দশক পর্যন্ত ভারতের বাক্স্বাধীনতা সংক্রান্ত বিচারিক সিদ্ধান্তগুলোকে কাঠামোবদ্ধ করে রেখেছিল। বিধানটি স্বাধীনতার পরও টিকে থাকে এবং *কেদার নাথ সিং বনাম বিহার রাজ্য* (১৯৬২) মামলায় একটি সংকীর্ণ ব্যাখ্যাসহ বহাল রাখা হয়।

এর পরবর্তী ইতিহাস দেখায় যে এ ধরনের আইনগুলো বিলুপ্ত করা কতটা কঠিন। ২০২২ সালের মে মাসে ভারতের সুপ্রিম কোর্ট *এস.জি. ভোম্বাটকেরে বনাম ভারত ইউনিয়ন* মামলায় ১২৪এ ধারার কার্যকারিতা স্থগিত রাখেন। ২০২৪ সালের জুলাইয়ে যখন ভারতীয় ন্যায় সংহিতা দণ্ডবিধিকে প্রতিস্থাপন করে, তখন সেখানে "রাষ্ট্রদ্রোহ" শব্দটি বাদ দেওয়া হলেও ভারতের সার্বভৌমত্ব, ঐক্য ও অখণ্ডতা বিপন্নকারী কাজের বিষয়ে ১৫২ ধারা প্রবর্তন করা হয়, যাকে আবেদনকারীরা নতুন মোড়কে রাষ্ট্রদ্রোহ অপরাধ হিসেবে চ্যালেঞ্জ করেছেন (সনকার, ২০২৬)। এই প্রতিবেদন লেখার সময় পর্যন্ত সেই চ্যালেঞ্জটি বিচারাধীন ছিল।

২.৪ দুই বিশ্বযুদ্ধের মধ্যবর্তী কাল: গণতন্ত্র ও একনায়কতন্ত্রের মিলনবিন্দু

স্কিনার (২০১৬) ১৯৩০ সালের ইতালীয় ফ্যাসিস্ট দণ্ডবিধিতে রাষ্ট্রের "অবমাননা" অপরাধের সাথে একই সময়ের ইংরেজ রাষ্ট্রদ্রোহমূলক কুৎসার তুলনা করেছেন। তিনি দুটি অপরাধের পরিধি ও উদ্দেশ্যের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ মিল খুঁজে পান এবং যুক্তি দেন যে একটি উদারনৈতিক গণতন্ত্র এবং একটি ফ্যাসিস্ট রাষ্ট্র বাক্-আইন দ্বারা সুরক্ষিত রাষ্ট্রীয় স্বার্থ সম্পর্কে একই ধরনের ধারণা পোষণ করত। এই পর্যবেক্ষণটি অস্বস্তিকর এবং এই প্রতিবেদনের মূল বক্তব্যের কেন্দ্রবিন্দু: বাক্-অপরাধ কেবল একনায়কতন্ত্রের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য নয়। গণতন্ত্রও এগুলো তৈরি করে, এবং সেই হাতিয়ারগুলো পরবর্তীতে যে-ই শাসন ক্ষমতায় আসুক তার নাগালে থেকে যায় এবং তারা যার চেহারা পছন্দ নয় তাদের ঘায়েল করতে এর যথেচ্ছ ব্যবহার করে।

২.৫ যুদ্ধকালীন আমেরিকা: এসপিওনাজ ও সিডিশন অ্যাক্টস

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় ১৯১৭ সালের এসপিওনাজ অ্যাক্ট এবং ১৯১৮ সালের সিডিশন অ্যাক্ট যুদ্ধ-প্রচেষ্টায় বিঘ্ন সৃষ্টিকারী মিথ্যা বক্তব্য এবং সরকার সম্পর্কে "অবিশ্বস্ত" বা "অবমাননাকর" ভাষাকে অপরাধ হিসেবে ঘোষণা করে। সোশ্যালিস্ট পার্টির নেতা ইউজিন ডেবসকে ১৯১৮ সালের জুনে ওহাইওর ক্যান্টনে একটি যুদ্ধবিরোধী ভাষণ দেওয়ার জন্য ফেডারেল কারাগারে দশ বছরের কারাদণ্ড দেওয়া হয় এবং সুপ্রিম কোর্ট ১৯১৯ সালে সর্বসম্মতিক্রমে তার সাজা বহাল রাখেন। ১৯২০ সালে তিনি কারাকক্ষ থেকেই প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। স্টোন (২০০৪) দেখান যে ভিন্নমতাবলম্বীদের বিচারের মুখোমুখি করার চাপ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ও ফিরে এসেছিল, যখন প্রশাসনের সমালোচকদের মিথ্যাচারের ফেরিওয়ালা বলে তকমা দেওয়া হয়েছিল, এবং তিনি ১৭৯৮ সালের বিচারগুলোর সাথে এর তুলনা টেনেছেন।

২.৬ ফৌজদারি মানহানি যা কখনোই বিদায় নেয়নি: যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডা

লিসবি (২০০৪) যুক্তি দেন যে গণতন্ত্রে ফৌজদারি মানহানির কোনো বৈধ স্থান নেই এবং এর অব্যাহত অস্তিত্ব বক্তাদের সমতার প্রতি প্রথম সংশোধনীর অঙ্গীকারের সাথে অসামঞ্জস্যপূর্ণ। অভিজ্ঞতালব্ধ গবেষণা দেখায় যে অপরাধটি হারিয়ে যায়নি। প্রিচার্ড (২০০৯) দেখেছেন যে ১৯৯১ থেকে ২০০৭ সালের মধ্যে উইসকনসিনে পণ্ডিতদের ধারণার চেয়ে অনেক বেশি বার ফৌজদারি মানহানির বিচার করা হয়েছিল। কানাডায় টেইলর এবং প্রিচার্ড (২০১৮) ২০০০ সাল থেকে ৪০০টিরও বেশি ফৌজদারি মানহানির মামলা শনাক্ত করেছেন, যার একটি বড় অংশই নাগরিকদের রাজনৈতিক বক্তব্যকে, বিশেষ করে পুলিশ ও অন্যান্য বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তাদের সমালোচনাকে, শাস্তি দিয়েছে। তাদের গবেষণাপত্রের শিরোনামটি এই প্রতিবেদনের একটি মূল ভাবকে ধারণ করে: বিচারিক প্রক্রিয়াই হলো শাস্তি।

২.৭ ডিজিটাল মোড়: সাইবার অপরাধ যখন ঝুঁকির মাত্রা বাড়িয়ে দেয়

২০০০-এর দশকের মাঝামাঝি থেকে বহু রাষ্ট্র ইলেকট্রনিক যোগাযোগের জন্য নতুন নতুন অপরাধের বিধান প্রণয়ন করে। এসব বিধান প্রায়শই বিদ্যমান মানহানি বা জনশৃঙ্খলা সংক্রান্ত অপরাধগুলোরই পুনরাবৃত্তি ঘটায়, এবং বক্তব্যটি অনলাইনে প্রকাশিত হওয়ার কারণে এর সাথে আরও কঠোর শাস্তি ও শিথিল পদ্ধতিগত সুরক্ষা জুড়ে দেয়।

বাংলাদেশ: আইসিটি আইন, ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন, সাইবার নিরাপত্তা আইন

শাস্তির ক্রমবর্ধমান কঠোরতা বা র‍্যাচেটের সবচেয়ে স্পষ্ট উদাহরণ দেয় বাংলাদেশ। বিএনপি-জামায়াত সরকারের আমলে পাস হওয়া ২০০৬ সালের তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইনে মিথ্যা, অশ্লীল বা মানহানিকর ইলেকট্রনিক উপাদান প্রকাশের জন্য সর্বোচ্চ দশ বছরের কারাদণ্ডের বিধান ছিল। ২০১৩ সালে আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে এর ৫৭ ধারা সংশোধন করে সর্বনিম্ন সাত বছর এবং সর্বোচ্চ চৌদ্দ বছরের কারাদণ্ড নির্ধারণ করা হয়, অপরাধটিকে অজামিনযোগ্য করা হয় এবং পরোয়ানা ছাড়াই গ্রেপ্তারের অনুমতি দেওয়া হয়। অথচ মুদ্রিত মাধ্যমে একই মানহানিকর বক্তব্যের জন্য দণ্ডবিধির অধীনে সর্বোচ্চ দুই বছরের সাজার বিধান ছিল। সেন্টার ফর গভর্ন্যান্স স্টাডিজের জন্য আলী রিয়াজের গবেষণা অনুযায়ী, ২০১২ থেকে ২০১৭ সালের জুন পর্যন্ত আইসিটি আইনের অধীনে ১,৪১৭টি মামলা দায়ের করা হয়েছিল, যার প্রায় ৬৫ শতাংশই ছিল ৫৭ ধারার অধীনে।

২০১৮ সালে ৫৭ ধারা বাতিল করে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন (ডিএসএ) দ্বারা প্রতিস্থাপন করা হয়, যা বাক্-সংক্রান্ত অপরাধগুলোকে বহাল রাখে এবং আরও সম্প্রসারিত করে। লেসি এবং মুখার্জি (২০২০) আইসিটি আইন ও ডিএসএ-কে "মশা মারতে কামান দাগা" হিসেবে বর্ণনা করেছেন: আইনগুলো প্রভাবশালী ব্যক্তি, দলীয় অনুগত এবং মনোযোগপ্রত্যাশীদের "ডিজিটাল ভিজিল্যান্টি" হিসেবে কাজ করতে সক্ষম করেছিল, এবং বিচারাধীন অভিযোগগুলোকে ঝুলিয়ে রাখা হতো যাতে পরে আবার সচল করা যায়, যা ভীতিকে একটি স্থায়ী পরিবেশে পরিণত করেছিল। ভৌমিক এবং ফিশার (২০২৬) পনেরোজন ডিজিটাল সাংবাদিকের সাক্ষাৎকার নিয়ে দেখেছেন যে ডিএসএ কারাবাস এমনকি গুম হওয়ার ভীতি তৈরি করেছিল এবং প্রতিবেদকদের "প্রতিরক্ষামূলক সাংবাদিকতা"-র দিকে ঠেলে দিয়েছিল। জাফরউল্লাহ এবং নুঘাত (২০২৬) দলিলবদ্ধ করেছেন কীভাবে আইনটি সাধারণ সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ব্যবহারকারীদের মধ্যে আত্ম-সেন্সরশিপকে উস্কে দিয়েছিল।

এর মানবিক মূল্য দৃশ্যমান হয়ে ওঠে লেখক মুশতাক আহমেদের ঘটনায়, যাকে মহামারি মোকাবিলায় সরকারের ভূমিকার সমালোচনা করে ফেসবুক পোস্ট দেওয়ার কারণে ২০২০ সালের মে মাসে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। তার জামিন ছয়বার নামঞ্জুর করা হয় এবং প্রাক্-বিচার আটকাবস্থায় প্রায় দশ মাস কাটানোর পর ২০২১ সালের ২৫ ফেব্রুয়ারি কাশিমপুর কারাগারে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। তিনি কখনোই দোষী সাব্যস্ত হননি। ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ কেবল ২০২০ সালেই ৪৫৭ জন ব্যক্তির বিরুদ্ধে ১৯৭টি ডিএসএ মামলার কথা জানিয়েছে।

ডিএসএ-কে ২০২৩ সালের সাইবার নিরাপত্তা আইন দ্বারা এবং ২০২৪ সালের রাজনৈতিক পরিবর্তনের পর ২০২৫ সালের মে মাসে গেজেটভুক্ত সাইবার সুরক্ষা অধ্যাদেশ ২০২৫ দ্বারা প্রতিস্থাপন করা হয়। অধ্যাদেশটি নয়টি বিতর্কিত ধারা বাতিল করে, যা আইন উপদেষ্টার ভাষ্যমতে প্রায় ৯৫ শতাংশ মামলার উৎস ছিল (যার মধ্যে মানহানি, "মিথ্যা" বা "আক্রমণাত্মক" তথ্য এবং মুক্তিযুদ্ধ ও জাতির পিতা সংক্রান্ত অপরাধ অন্তর্ভুক্ত ছিল), সেগুলোর অধীনে বিচারাধীন মামলাগুলো খারিজ করার আদেশ দেয় এবং অবশিষ্ট বাক্-সম্পর্কিত অপরাধগুলোকে জামিনযোগ্য করে। ভাষ্যকাররা উল্লেখ করেছেন যে এটি এখনো কিছু অভিব্যক্তি-সংক্রান্ত অপরাধের জন্য কারাদণ্ড এবং আধেয়র ওপর রাষ্ট্রের ব্যাপক ক্ষমতা বহাল রেখেছে। এই ধারাবাহিকতা বর্তমান প্রতিবেদনের যুক্তির জন্য গুরুত্বপূর্ণ: একই আইনি কাঠামো এক দলের হাতে রচিত হয়েছিল, তার প্রতিদ্বন্দ্বী দলের হাতে আরও তীব্র হয়েছিল এবং কেবল সরকার পরিবর্তনের পরই তা ভেঙে ফেলা হয়েছে।

ভারত: আইটি আইনের ৬৬এ ধারা

ভারতের তথ্যপ্রযুক্তি আইনের ৬৬এ ধারায় "চরম আক্রমণাত্মক" বা "ভীতিপ্রদ" বার্তা এবং "বিরক্তি" বা "অসুবিধা" সৃষ্টির উদ্দেশ্যে পাঠানো মিথ্যা তথ্যের জন্য সর্বোচ্চ তিন বছরের কারাদণ্ডের বিধান ছিল। সুপ্রিম কোর্ট শ্রেয়া সিঙ্ঘল বনাম ভারত ইউনিয়ন (২০১৫) মামলায় অসাংবিধানিকভাবে অস্পষ্ট হওয়ার কারণে ধারাটি বাতিল করে দেন। তবুও পুলিশ এটি ব্যবহার করতে থাকে। আদালতে দাখিল করা আবেদনে পিপলস ইউনিয়ন ফর সিভিল লিবার্টিজ জানায় যে ওই রায়ের পর এগারোটি রাজ্যে ১,৩০৭টি মামলা নথিভুক্ত হয়েছে, এবং ২০২২ সালের অক্টোবরের আগে আদালত বিচারাধীন সব ৬৬এ মামলা বন্ধ করার আদেশ দেননি। অর্থাৎ একটি বাক্-অপরাধ তার নিজের অবৈধ ঘোষণার পরও সাত বছর বেঁচে থাকতে পারে। মিত্তাল (২০১৬) পরীক্ষা করে দেখেছেন শ্রেয়া সিঙ্ঘল রায়ের নিহিতার্থ রাষ্ট্রদ্রোহ বিধানের ক্ষেত্রে কী ছিল।

ফিলিপাইন: সাইবার-মানহানি

২০১২ সালের সাইবারক্রাইম প্রিভেনশন অ্যাক্ট ফৌজদারি মানহানিকে অনলাইন প্রকাশনায় সম্প্রসারিত করে এবং শাস্তির মাত্রা এক ধাপ বাড়িয়ে দেয়। আবেদে এবং রবি (২০১৫) মার্কোস-আমলের সংবাদমাধ্যম দমনের কথা স্মরণ করে সাংবাদিকদের দ্বারা এই আইনকে "ই-সামরিক আইন"-এর সাথে তুলনা করার বিষয়টি বর্ণনা করেছেন। ২০২০ সালের জুনে সাংবাদিক ও পরবর্তীতে শান্তিতে নোবেলজয়ী মারিয়া রেসা এবং সাবেক গবেষক রেইনালদো সান্তোস জুনিয়রকে ২০১২ সালের একটি নিবন্ধের জন্য সাইবার-মানহানির দায়ে দোষী সাব্যস্ত করা হয়, এমন এক আইনের অধীনে যা নিবন্ধটি প্রথম প্রকাশিত হওয়ার পরে পাস হয়েছিল। আপিল আদালত ২০২২ সালে সাজা বহাল রাখেন এবং সর্বোচ্চ সাজার মেয়াদ বাড়িয়ে ছয় বছরেরও বেশি করেন; এই পর্যালোচনার জন্য পাওয়া সর্বশেষ প্রতিবেদন অনুযায়ী সুপ্রিম কোর্টে আপিলটি এখনো বিচারাধীন। অথচ ২০১১ সালেই জাতিসংঘ মানবাধিকার কমিটি অ্যাডোনিস বনাম ফিলিপাইন মামলায় সিদ্ধান্ত দিয়েছিল যে মানহানির জন্য কোনো সম্প্রচারকারীকে কারাদণ্ড দেওয়া আইসিসিপিআর-এর ১৯ অনুচ্ছেদের লঙ্ঘন।

নাইজেরিয়া: সাইবারক্রাইম অ্যাক্ট

নাইজেরিয়ার ২০১৫ সালের সাইবারক্রাইম অ্যাক্টের ২৪ ধারায় "সাইবারস্টকিং"-কে অপরাধ হিসেবে ঘোষণা করা হয়, যার মধ্যে মিথ্যা বলে জানা সত্ত্বেও "বিরক্তি" বা "অপমান" করার উদ্দেশ্যে পাঠানো বার্তাও অন্তর্ভুক্ত ছিল। আদিবে, ইকে এবং উদেওগু (২০১৭) দেখান যে এই আইনের পর নাইজেরিয়ার অনলাইন গণমাধ্যম-স্বাধীনতার র‍্যাঙ্কিংয়ের অবনতি ঘটে এবং তারা রাজনৈতিক নেতাদের দ্বারা সাংবাদিকদের বিরুদ্ধে আইনটির ব্যবহারকে এর কারণ হিসেবে চিহ্নিত করেন। ২০২২ সালের মার্চে ইকোওয়াস কোর্ট অব জাস্টিস ২৪ ধারাটিকে স্বেচ্ছাচারী, অস্পষ্ট ও নিপীড়নমূলক বলে রায় দেন এবং নাইজেরিয়াকে তা বাতিল বা সংশোধনের আদেশ দেন। ২০২৪ সালের একটি সংশোধনী ধারাটিকে নতুন করে লিখলেও নাগরিক সমাজের হামলাকারীদের যুক্তি হলো নতুন সংস্করণটি, যা এখনো "আইনশৃঙ্খলার অবনতি" ঘটাতে পারে এমন বার্তাকে অপরাধ হিসেবে গণ্য করে, মূল সমস্যাটিকেই পুনরুৎপাদন করেছে।

২.৮ "ভুয়া সংবাদ"-এর ঢেউ, ২০১৮ থেকে ২০২৬

২০১৬ সালের পর "ভুয়া সংবাদ" বা "ফেইক নিউজ" একটি বৈশ্বিক রাজনৈতিক শব্দভাণ্ডারে পরিণত হয়, এবং নতুন প্রজন্মের আইনগুলো কোনো নির্দিষ্ট ব্যক্তির মানহানি হওয়ার শর্ত ছাড়াই সরাসরি অসত্যতাকেই অপরাধ হিসেবে ঘোষণা করে।

- **মালয়েশিয়া (২০১৮)।** সাধারণ নির্বাচনের কয়েক সপ্তাহ আগে ২০১৮ সালের এপ্রিলে অ্যান্টি-ফেক নিউজ অ্যাক্ট কার্যকর হয়, যাতে সর্বোচ্চ ছয় বছরের কারাদণ্ড এবং ৫,০০,০০০ রিঙ্গিত জরিমানার বিধান ছিল। এতে প্রথম দোষী সাব্যস্ত ব্যক্তি ছিলেন একজন ডেনীয় পর্যটক, যিনি পুলিশের সাড়া দেওয়ার সময় নিয়ে সমালোচনা করে একটি ভিডিও পোস্ট করেছিলেন; তাকে এক সপ্তাহের কারাদণ্ড ও জরিমানা করা হয় এবং জরিমানা দিতে অপারগতা প্রকাশ করায় তাকে এক মাসের বিকল্প কারাদণ্ডের মুখোমুখি হতে হয়। যে সরকার আইনটি পাস করেছিল তারা নির্বাচনে হেরে যায় এবং পরবর্তী সরকার কয়েক মাসের মধ্যেই তা বাতিলের উদ্যোগ নেয়।
- **সিঙ্গাপুর (২০১৯)।** প্রোটেকশন ফ্রম অনলাইন ফলসহুডস অ্যান্ড ম্যানিপুলেশন অ্যাক্ট (পোফমা) মূলত মন্ত্রীপর্যায়ের "সংশোধন নির্দেশনা"-র ওপর নির্ভর করে, কিন্তু এর ৭ ধারায় জেনেশুনে ক্ষতিকর মিথ্যা তথ্যমূলক বিবৃতি প্রচার করাকে সর্বোচ্চ পাঁচ বছর এবং গুরুতর ক্ষেত্রে

দশ বছর পর্যন্ত কারাদণ্ডে দণ্ডনীয় অপরাধ হিসেবে গণ্য করা হয়েছে। ২০২৬ সালের মার্চে একজন সরকার সমালোচকের বিরুদ্ধে ৭ ধারার অধীনে প্রথম ফৌজদারি মামলা দায়ের করা হয়। তেও এবং কিউ (২০২১) আপিলের ক্ষেত্রে কোনো বক্তব্য মিথ্যা প্রমাণ করার দায়ভার কার ওপর বর্তাবে তা নিয়ে হাইকোর্টের পরস্পরবিরোধী প্রারম্ভিক রায়গুলো বিশ্লেষণ করেছেন।

- **হাঙ্গেরি (২০২০)।** ২০২০ সালের ৩০ মার্চ জরুরি কোভিড-১৯ আইন "আতঙ্ক ছড়ানো"-র অপরাধকে সম্প্রসারিত করে এবং মহামারি মোকাবিলায় বিঘ্ন সৃষ্টিকারী মিথ্যা বা বিকৃত বক্তব্যের জন্য সর্বোচ্চ পাঁচ বছরের কারাদণ্ডের অনুমোদন দেয়। কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই পুলিশ ৮৬টি তদন্ত শুরু করে, যার মধ্যে সমালোচনামূলক ফেসবুক পোস্টের কারণে আটকের ঘটনাও ছিল।

- **রাশিয়া (২০২২)।** ২০২২ সালের ৪ মার্চ গৃহীত ফৌজদারি দণ্ডবিধির ২০৭.৩ অনুচ্ছেদে সশস্ত্র বাহিনীর ব্যবহার সম্পর্কে "জেনেশুনে মিথ্যা তথ্য" প্রচারের জন্য সর্বোচ্চ পনেরো বছরের কারাদণ্ডের বিধান রাখা হয়। ইউক্রেনে শিশুদের মৃত্যু নিয়ে কাউন্সিল সভায় মন্তব্য করার জন্য মস্কোর মিউনিসিপ্যাল কাউন্সিলর আলেক্সেই গোরিনভকে সাত বছরের কারাদণ্ড দেওয়া হয়। শেরস্তোবোয়েভা (২০২৪) ২০২২ ও ২০২৩ সালের ৪৪৬টি আদালতের রায় বিশ্লেষণ করে দেখান যে আদালত প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের আনুষ্ঠানিক বিবৃতির যেকোনো বিচ্যুতিকেই মিথ্যা হিসেবে গণ্য করেছে, ফলে সত্যতা আনুগত্যের শর্তাধীন হয়ে পড়ে। স্বাধীন গণমাধ্যমের সংকলিত আদালতি পরিসংখ্যানে ২০২৪ সালে এই অনুচ্ছেদের অধীনে ৮২টি সাজার হিসাব পাওয়া গেছে।

- **তুরস্ক (২০২২)।** ৭৪১৮ নং আইন দণ্ডবিধিতে ২১৭/এ অনুচ্ছেদ যুক্ত করে, যেখানে জনসমক্ষে "বিভ্রান্তিকর তথ্য" প্রচারের জন্য এক থেকে তিন বছরের কারাদণ্ডের বিধান রাখা হয়। ইউসেল (২০২৫) এটিকে "হাইব্রিড ডিজিটাল কর্তৃত্ববাদ"-এর একটি মডেলের ভেতর স্থাপন করেছেন। এতে প্রথম দণ্ডিত সাংবাদিক সিনান আইগুল ইতিমধ্যে সংশোধন করে নেওয়া একটি পোস্টের জন্য দশ মাসের কারাদণ্ড পান; ২০২৪ সালে কোর্ট অব ক্যাসেশন সেই সাজা বাতিল করেন। তবুও বিচার চলতে থাকে এবং ২০২৬ সালের এপ্রিলে ইস্তাম্বুলের আদালত টেলিভিশন ভাষ্যের জন্য সাংবাদিকদের আড়াই বছর পর্যন্ত কারাদণ্ড প্রদান করেন।

- **ইন্দোনেশিয়া (২০২৩)।** নতুন দণ্ডবিধিতে জনশৃঙ্খলা বিঘ্নিতকারী ভুয়া সংবাদ প্রচারের অপরাধ বহাল রাখা হয়েছে। প্রহাসাচিত্ত এবং হারক্রিসনোও (২০২৪) এর যৌক্তিকতা ও সীমা বিশ্লেষণ করেছেন, অন্যদিকে আরিয়ানা ও তার সহকর্মীরা (২০২৬) ২০১৯ থেকে ২০২৪ সালের মধ্যে ইলেকট্রনিক ইনফরমেশন অ্যান্ড ট্রানজ্যাকশনস ল-এর অধীনে ৫৩০টিরও বেশি অপরাধীকরণের ঘটনা দলিলবদ্ধ করেছেন এবং আত্ম-সেন্সরশিপের প্রমাণ জরিপ করেছেন।

- **পাকিস্তান (২০২৫)।** প্রিভেনশন অব ইলেকট্রনিক ক্রাইমস (অ্যামেন্ডমেন্ট) অ্যাক্ট ২০২৫-এ ২৬(এ) ধারা যুক্ত করা হয়েছে, যেখানে মিথ্যা বলে জানা বা বিশ্বাস করার কারণ থাকা সত্ত্বেও "ভয়, আতঙ্ক বা বিশৃঙ্খলা" সৃষ্টি করতে পারে এমন তথ্য ইচ্ছাকৃতভাবে প্রচারের জন্য সর্বোচ্চ তিন বছরের কারাদণ্ড এবং ২০ লাখ রুপি জরিমানার বিধান রাখা হয়েছে। বিলটি উত্থাপনের প্রায় এক সপ্তাহের মধ্যে সংসদের উভয় কক্ষে পাস হয়।

পোমেরানজ এবং শুইড (২০২১) বিশ্বব্যাপী কোভিড-১৯ সংক্রান্ত ভুল তথ্যের বিরুদ্ধে সরকারি পদক্ষেপগুলো পর্যালোচনা করে দেখেছেন যে অভিব্যক্তিকে অপরাধ হিসেবে ঘোষণা করা ছিল রাষ্ট্রীয় পদক্ষেপের পাঁচটি প্রধান বর্গের একটি, যার পাশাপাশি আরও উদ্বেগজনক বর্গটি ছিল সরকারগুলোর নিজেদেরই সঠিক তথ্য সীমিত করা এবং মিথ্যা তথ্য ছড়ানো। ভেসে (২০২২) সতর্ক করেছেন যে স্বাস্থ্যগত জরুরি অবস্থা মতপ্রকাশের ওপর কঠোর নিষেধাজ্ঞা আরোপের একটি অজুহাত জোগায়।

২.৯ কঠোরতা বৃদ্ধির রেকর্ডের সারসংক্ষেপ

সময়কাল / স্থান	আইন	সর্বোচ্চ কারাদণ্ডের মাত্রা	পর্যবেক্ষণকৃত প্রবণতা
ইংল্যান্ড, ১২৭৫ থেকে	স্ক্যান্ডালাম ম্যাগনাটাম; রাষ্ট্রদ্রোহমূলক কুৎসা	কারাদণ্ড, পিলরি; ১৮৪৩ পর্যন্ত সত্যতা কোনো আত্মপক্ষ সমর্থন ছিল না	কর্মকর্তাদের সমালোচনা থেকে সুরক্ষা দেয়
যুক্তরাষ্ট্র, ১৭৯৮	সিডিশন অ্যাক্ট	সর্বোচ্চ ২ বছর এবং জরিমানা	ক্ষমতাসীন দল বিরোধী সম্পাদক ও একজন কংগ্রেস সদস্যের বিচার করে
ব্রিটিশ ভারত, ১৮৭০	দণ্ডবিধি ধারা ১২৪এ	যাবজ্জীবন কারাদণ্ড পর্যন্ত	স্বাধীনতার পরও বহাল থাকা ঔপনিবেশিক হাতিয়ার; ২০২৪ সালে নাম পরিবর্তন
যুক্তরাষ্ট্র, ১৯১৭–১৮	এসপিওনাজ ও সিডিশন অ্যাক্টস	সর্বোচ্চ ২০ বছর	যুদ্ধবিরোধী বক্তারা কারারুদ্ধ; ডেবসকে ১০ বছরের সাজা প্রদান
বাংলাদেশ, ২০০৬–২০২৩	আইসিটি আইন ধারা ৫৭; ডিএসএ; সিএসএ	১৪ বছর (২০১৩), অজামিনযোগ্য	শাস্তির ক্রমবর্ধমান কঠোরতা; প্রাক্-বিচার হাজতবাসে (custody) মৃত্যু
ভারত, ২০০৯–২০১৫	আইটি আইন ধারা ৬৬এ	৩ বছর	আইনটি বাতিল হওয়ার পরও ১,৩০৭টি মামলা দায়ের

সময়কাল / স্থান	আইন	সর্বোচ্চ কারাদণ্ডের মাত্রা	পর্যবেক্ষণকৃত প্রবণতা
ফিলিপাইন, ২০১২	সাইবারক্রাইম প্রিভেনশন অ্যাক্ট	মানহানির শাস্তি এক ধাপ বৃদ্ধি	নোবেলজয়ী সাংবাদিক দোষী সাব্যস্ত
মালয়েশিয়া, ২০১৮	অ্যান্টি-ফেক নিউজ অ্যাক্ট	৬ বছর	নির্বাচনের আগে পাস; নির্বাচনের পরে বাতিল
হাঙ্গেরি, ২০২০	আতঙ্ক ছড়ানো (জরুরি আইন)	৫ বছর	সমালোচনাকে অপরাধীকরণে মহামারির ব্যবহার
রাশিয়া, ২০২২	ফৌজদারি দণ্ডবিধি অনুচ্ছেদ ২০৭.৩	১৫ বছর	প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক সত্যের সংজ্ঞা নির্ধারণ
তুরস্ক, ২০২২	দণ্ডবিধি অনুচ্ছেদ ২১৭/এ	৩ বছর	সংশোধিত বা বিতর্কিত প্রতিবেদনের জন্য সাংবাদিকদের বিচার
পাকিস্তান, ২০২৫	পেকা ধারা ২৬(এ)	৩ বছর	তড়িঘড়ি করে পাস; অস্পষ্ট “আতঙ্ক” মানদণ্ড

সারণি ১. কারাদণ্ডের বিধানযুক্ত নির্বাচিত বাক্-অপরাধসমূহ। শাস্তির মাত্রাগুলো ২ নং অনুচ্ছেদে উদ্ধৃত উৎসগুলোতে উল্লিখিত সংবিধিবদ্ধ (statutory) সর্বোচ্চ সীমা।

৩. কঠোরতা কীভাবে বৃদ্ধি পায়: পৌনঃপুনিক কৌশলসমূহ

৩.১ অস্পষ্ট সংজ্ঞা বিচারের ভার প্রয়োগকারীর হাতে তুলে দেয়

"মিথ্যা", "বিভ্রান্তিকর", "আক্রমণাত্মক", "রাষ্ট্রের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ণকারী" এবং "আতঙ্ক সৃষ্টিকারী"-র মতো শব্দগুলোর কোনো স্থির আইনি অর্থ নেই। আদালত ভারতের ৬৬এ ধারা, নাইজেরিয়ার ২৪ ধারা এবং কেনিয়ার ফৌজদারি মানহানি আইন আংশিকভাবে এই কারণেই বাতিল করেছিলেন। শাস্তির মাত্রা যত বাড়ে অস্পষ্টতা তত বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে, কারণ কোনটি "মিথ্যা" হিসেবে গণ্য হবে তা নির্ধারণকারী ব্যক্তিই তখন নিয়ন্ত্রণ করেন কেউ তার স্বাধীনতার কয়েকটি বছর হারাবে কি না। তুরস্কে ২১৭/এ অনুচ্ছেদের অধীনে অভিযুক্ত সাংবাদিকরা জানিয়েছেন যে কর্তৃপক্ষ প্রায়ই বলতে ব্যর্থ হয় প্রতিবেদনের ঠিক কোন অংশটি বিভ্রান্তিকর।

৩.২ শাস্তির র‍্যাচেট বা ক্রমবর্ধমান কঠোরতা

বাক্-অপরাধগুলো কদাচিৎ তাদের প্রারম্ভিক মাত্রায় স্থির থাকে। বাংলাদেশ দশ বছর থেকে সর্বনিম্ন সাত বছরসহ চৌদ্দ বছরে উন্নীত হয়েছিল। ফিলিপাইন মানহানি অনলাইনে যাওয়ার সাথে সাথে এর শাস্তির মাত্রা এক ধাপ বাড়িয়ে দেয়। পাকিস্তানের ২০২৫ সালের খসড়ায় প্রথমে সাত বছরের প্রস্তাব করা হয়েছিল, যা পরে তিন বছরে স্থির হয়। প্রতিটি নতুন মাধ্যমকে (মুদ্রণ, সম্প্রচার, ইন্টারনেট, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম, এবং এখন জেনারেটিভ এআই) অনন্যভাবে বিপজ্জনক হিসেবে গণ্য করা হয় এবং তার জন্য আরও কঠোর বিধান তৈরি করা হয়, অথচ পুরোনো অপরাধগুলোও আইনের বইয়ে থেকে যায়। এর ফলাফল হলো একই বাক্যের জন্য সংবাদপত্রে দুই বছর এবং ফেসবুকে চৌদ্দ বছরের কারাদণ্ড হতে পারে।

৩.৩ বিচারিক প্রক্রিয়াই যখন শাস্তি

সাজা হিসেবে কারাদণ্ড ঝুঁকির একটি অংশমাত্র। অজামিনযোগ্য মর্যাদা, পরোয়ানা ছাড়া গ্রেপ্তার এবং দীর্ঘ প্রাক্-বিচার আটকাবস্থা রাষ্ট্রকে কোনো দোষী সাব্যস্তকরণ ছাড়াই মাসের পর মাস হাজতবাস চাপিয়ে দেওয়ার সুযোগ দেয়। মুশতাক আহমেদ কোনো রায় ছাড়াই মৃত্যুবরণ করেছেন। টেইলর এবং প্রিচার্ড (২০১৮) দেখান যে কানাডায় গ্রেপ্তার, অভিযোগ গঠন এবং দীর্ঘ বিচার প্রক্রিয়া পুলিশের সমালোচকদের সাজা না হলেও শাস্তি দিয়েছে। লেসি এবং মুখার্জি (২০২০) উল্লেখ করেন যে বাংলাদেশে অভিযোগগুলো প্রায়ই স্থগিত অবস্থায় রেখে দেওয়া হতো যাতে পরে আবার সচল করা যায়, যা অভিযুক্তকে স্থায়ী হুমকির মুখে রাখত। আটক রাখার অনুমতি দেয় এমন যেকোনো বাক্-অপরাধই এই ঝুঁকি বহন করে, তা শেষ পর্যন্ত যত কম ক্ষেত্রেই দোষী সাব্যস্তকরণে গড়াক না কেন।

৩.৪ বেসরকারি বা বহিরাগতদের হাতে আইন প্রয়োগের ভার অর্পণ

অনেক ডিজিটাল বাক্-আইন যেকোনো ব্যক্তিকে অভিযোগ দায়ের করার অনুমতি দেয়। বাংলাদেশে আলী রীয়াজ ২০২৩ সালে জানান যে তার দলের অধ্যয়নকৃত ডিএসএ মামলাগুলোর প্রায় ৩৯ শতাংশই দায়ের করেছিলেন তৎকালীন ক্ষমতাসীন দলের সাথে যুক্ত ব্যক্তিরা, এবং লেসি ও মুখার্জি (২০২০) এক শ্রেণির "ডিজিটাল ভিজিল্যান্টি"-র বর্ণনা দিয়েছেন যারা ব্যক্তিগত ও রাজনৈতিক প্রতিশোধ নিতে এই আইন ব্যবহার করে। এটি কেন্দ্রীয় সরকার নিজে যে পরিমাণ মামলা পরিচালনা করত তার চেয়ে বহুগুণ বেশি মামলার জন্ম দেয়, অথচ সরকারকে দায় অস্বীকারের সুযোগ করে দেয়।

৩.৫ জম্বি আইন এবং হাতবদল হওয়া আইন

আদালত অবৈধ ঘোষণা করার পরও (ভারতের ৬৬এ ধারা), সরকার পর্যালোচনার প্রতিশ্রুতি দেওয়ার পরও (১২৪এ ধারা থেকে ১৫২ ধারায় রূপান্তর), এবং রচয়িতারা ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার পরও বাক্-অপরাধগুলো টিকে থাকে। বাংলাদেশের আইসিটি আইন এক সরকারের আমলে লেখা হয়েছিল এবং তার প্রতিদ্বন্দ্বী সরকারের হাতে চৌদ্দ বছরের অজামিনযোগ্য অপরাধে পরিণত হয়েছিল। মালয়েশিয়ার অ্যান্টি-ফেক নিউজ অ্যাক্ট এমন এক সরকারকে রক্ষা করতে পাস করা হয়েছিল যারা কয়েক সপ্তাহ পরই নির্বাচনে হেরে যায়। ১৭৯৮ সালের আমেরিকান সিডিশন অ্যাক্ট প্রণয়ন করেছিল ফেডারেলিস্টরা, এবং আইনটির মেয়াদ শেষ না হলে রিপাবলিকান প্রশাসনের অধীনে তারা নিজেরাই এর শিকারে পরিণত হতো। **যে আইনপ্রণেতা এই ভেবে কোনো বাক্-অপরাধ সমর্থন করেন যে "আমাদের পক্ষ" এটি দায়িত্বশীলভাবে প্রয়োগ করবে, তিনি এই ইতিহাসের বিরুদ্ধে বাজি ধরছেন।**

৪. মূল যুক্তি: বাক্-অপরাধে কখনোই কারাদণ্ড বা ফেলনি মর্যাদা থাকা উচিত নয়

৪.১ সম্ভাব্য সবচেয়ে নিকৃষ্ট সরকারের কথা মাথায় রেখে আইন প্রণয়ন করুন

মূল যুক্তিটি প্রাতিষ্ঠানিক। আইন এমন একটি হাতিয়ার যা এর রচয়িতাদের চেয়েও বেশি দিন টিকে থাকে। যখন কোনো আইনসভা সিদ্ধান্ত নেয় যে মিথ্যা বা মানহানিকর বক্তব্যের জন্য কারাদণ্ড দেওয়া যাবে কি না, তখন তারা আসলে ভবিষ্যতের প্রতিটি সরকারের হাতে, যার মধ্যে অবৈধ, দুর্নীতিগ্রস্ত বা কর্তৃত্ববাদী সরকারও থাকতে পারে, কী ক্ষমতা তুলে দেওয়া হবে তা নির্বাচন করে। উপরের ঐতিহাসিক রেকর্ড দেখায় যে বাস্তবে এই ক্ষমতা হস্তান্তর ঘটেই: নির্বাচনের মুখোমুখি ক্ষমতাসীন দল (১৭৯৮, মালয়েশিয়া ২০১৮), জরুরি অবস্থায় থাকা সরকার (হাঙ্গেরি ২০২০), যুদ্ধে লিপ্ত সরকার (যুক্তরাষ্ট্র ১৯১৮, রাশিয়া ২০২২), এবং ক্ষমতা সুসংহতকারী সরকার (বাংলাদেশ ২০১৩ থেকে ২০২৩, তুরস্ক ২০২২), সবাই আইনের বইয়ে খুঁজে পাওয়া বা দ্রুত তৈরি করা যায় এমন কারাদণ্ডযোগ্য বাক্-অপরাধের দিকেই হাত বাড়িয়েছে।

এই পরীক্ষার অধীনে আইনপ্রণেতাদের প্রশ্ন করা উচিত, ক্ষমতায় আসতে পারে এমন সবচেয়ে নিকৃষ্ট সরকারের হাতে পড়লে আইনটি কী পরিমাণ ক্ষতি করতে পারে। কারাদণ্ড এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারে না, কারণ এটিই একমাত্র শাস্তি যা কোনো সমালোচককে জনজীবন থেকে শারীরিকভাবে সরিয়ে দেয়, বিচারের আগেই আরোপ করা যায় এবং দীর্ঘায়িত করে কারও পেশাজীবন বা জীবন শেষ করে দেওয়া যায়। পক্ষান্তরে জরিমানা, তা যত বড়ই হোক না কেন, বক্তাকে পুনরায় কথা বলার, আপিল করার, সংগঠিত হওয়ার এবং ভোট দেওয়ার জন্য মুক্ত রাখে।

৪.২ বাক্-সংক্রান্ত মামলায় রাষ্ট্র এমন এক বিরোধের বিচার করে যেখানে সে নিজেই একটি পক্ষ

বেশিরভাগ ভুয়া-সংবাদ অপরাধেই একজন প্রসিকিউটর এবং পরবর্তীতে একটি আদালতকে জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে কোনটি সত্য তা নির্ধারণ করতে বলা হয়। যখন বিষয়বস্তু হয় সরকারের কর্মকাণ্ড, তখন রাষ্ট্র একই সাথে অভিযোগকারী এবং সবচেয়ে স্বার্থসংশ্লিষ্ট পক্ষ। শেরস্তোবোয়েভা (২০২৪) রাশিয়ায় এই কাঠামোর চূড়ান্ত পরিণতি দেখিয়েছেন, যেখানে আদালত প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের বিবরণকেই সত্যের সংজ্ঞা হিসেবে গণ্য করেছে। তুর্কি সাংবাদিকরাও একই প্রবণতার কথা বর্ণনা করেছেন, যেখানে সরকার থেকে প্রাপ্ত নয় এমন যেকোনো তথ্যই মিথ্যা বলে চিহ্নিত হওয়ার ঝুঁকিতে থাকে। এমনকি অপেক্ষাকৃত ভালোভাবে কার্যকর ব্যবস্থাগুলোতেও মহামারি, যুদ্ধ এবং অর্থনৈতিক নীতি সম্পর্কিত তথ্যগুলো বিতর্কিত থাকে এবং নতুন প্রমাণ আসার সাথে সাথে পরিবর্তিত হয়। এক বছরে ভুল তথ্য বলে চিহ্নিত বক্তব্য পরের বছর মূলধারার সত্যে পরিণত হতে পারে। এত অস্থিতিশীল একটি বিচারিক সিদ্ধান্তের সাথে বছরের পর বছর কারাদণ্ড জুড়ে দেওয়া দৃশ্যতই অসামঞ্জস্যপূর্ণ।

৪.৩ শাস্তির কঠোরতার সাথে পাল্লা দিয়ে ভীতিজনিত নীরবতা (সেলফ সেন্সরশিপ) বৃদ্ধি পায়

কোয়েনেন (২০১২) যুক্তি দেন যে বাক্স্বাধীনতার মামলায় আদালতের "শাস্তি-সংবেদনশীল" হওয়া উচিত, কারণ শাস্তির তীব্রতা নির্ধারণ করে দেয় কোনো বিধান কী পরিমাণ সুরক্ষিত অভিব্যক্তিকে নিরুৎসাহিত করবে। পরিমিত জরিমানা হিসেবে যে নিয়মটি সহনীয়, কারাদণ্ড হিসেবে সেটিই অসাংবিধানিক হতে পারে। অভিজ্ঞতালব্ধ গবেষণা এটি সমর্থন করে। ভৌমিক এবং ফিশার (২০২৬) দেখেছেন যে কেবল আইনি দায়বদ্ধতার ভয় নয়, বরং কারাগারের ভয়ই বাংলাদেশের সাংবাদিকতাকে নতুন ছাঁচে ঢেলে সাজিয়েছিল। আরিয়ানা ও তার সহকর্মীরা (২০২৬) ইন্দোনেশিয়ায় ক্রমবিস্তারমান ভীতিজনিত নীরবতার প্রভাব বর্ণনা করেছেন যা কেবল অভিযুক্ত ব্যক্তিদের গণ্ডি ছাড়িয়ে বহুদূর বিস্তৃত হয়। যেহেতু বেশিরভাগ মানুষই অনুমান করতে পারে না একটি অস্পষ্ট নিয়ম কীভাবে প্রয়োগ করা হবে, তারা সবচেয়ে খারাপ পরিণতির কথা ভেবেই সাড়া দেয়, আর কারাদণ্ড সেই সবচেয়ে খারাপ পরিণতিটিকে বিপর্যয়কর করে তোলে।

৪.৪ আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আইন ইতোমধ্যে এই পথই নির্দেশ করে

জাতিসংঘ মানবাধিকার কমিটির সাধারণ মন্তব্য নং ৩৪ (২০১১), যা আইসিসিপিআর-এর ১৯ অনুচ্ছেদের প্রামাণ্য ব্যাখ্যা, তার ৪৭ অনুচ্ছেদে বলেছে যে রাষ্ট্রগুলোর মানহানিকে অপরাধমুক্ত করার বিষয়টি বিবেচনা করা উচিত, ফৌজদারি আইন কেবল সবচেয়ে গুরুতর ক্ষেত্রেই প্রয়োগ করা উচিত এবং কারাদণ্ড কখনোই উপযুক্ত শাস্তি নয়। কমিটি *অ্যাডোনিস বনাম ফিলিপাইন* (২০১১) মামলায় সেই মানদণ্ড প্রয়োগ করেছে। আঞ্চলিক আদালতগুলোও তা অনুসরণ করেছে। শেলটন (২০১৫) ব্যাখ্যা করেছেন কীভাবে আফ্রিকান কোর্ট অন হিউম্যান অ্যান্ড পিপলস রাইটস *কোনাতে বনাম বুরকিনা ফাসো* (২০১৪) মামলায় রায় দিয়েছিল যে মানহানির দায়ে একজন সাংবাদিককে কারাদণ্ড দেওয়া আফ্রিকান সনদের লঙ্ঘন, যেখানে তারা জাতীয় "ক্লব্যাক" ধারাগুলোর ওপর নির্ভর না করে প্রয়োজনীয়তা ও আনুপাতিকতার নীতি প্রয়োগ করেছিলেন। জিম্বাবুয়ের সাংবিধানিক আদালত (*মাদানহিরে*, ২০১৪), কেনিয়ার হাইকোর্ট (*ওকুটা*, ২০১৭) এবং লেসোথোর সাংবিধানিক আদালত (*পেটা*, ২০১৮) ফৌজদারি মানহানি সম্পূর্ণভাবে বাতিল করে দিয়েছেন এবং ইকোওয়াস আদালত নাইজেরিয়ার সাইবারস্টকিং বিধানের নিন্দা জানিয়েছেন (২০২২)। স্পাইচ, নোলাস্কো এবং নভোভিচ (২০১৬) ইউরোপীয় ইউনিয়ন ও বলকান রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে একটি অনুরূপ, যদিও অসম, অপরাধমুক্তকরণ আন্দোলনের চিত্র তুলে ধরেছেন।

এই প্রতিবেদনটি সাধারণ মন্তব্য নং ৩৪-এর চেয়েও এক ধাপ এগিয়ে যায়, যা এখনো "সবচেয়ে গুরুতর ক্ষেত্রে" ফৌজদারি মানহানির অনুমতি দেয়। এই প্রতিবেদনের যুক্তি হলো, যে যুক্তি মানহানির ক্ষেত্রে কারাদণ্ডকে নাকচ করে, ঠিক সেই একই যুক্তি ভুয়া-সংবাদ এবং ভুল তথ্য সংক্রান্ত অপরাধের ক্ষেত্রেও কারাদণ্ডকে নাকচ করে, কারণ সুনির্দিষ্ট কোনো ভুক্তভোগী না থাকায় এগুলো মানহানির চেয়েও বেশি অস্পষ্ট এবং বেশি রাজনৈতিক।

৪.৫ দেওয়ানি ও প্রশাসনিক প্রতিকার ইতোমধ্যে বিদ্যমান

জিম্বাবুয়ে, কেনিয়া এবং লেসোথোর আদালত যুক্তি দিয়েছিলেন যে ফৌজদারি মানহানি অপ্রয়োজনীয়, কারণ যার সুনাম ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তিনি ক্ষতিপূরণের জন্য দেওয়ানি (civil) মামলা করতে পারেন। বেশিরভাগ ভুল তথ্যের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য: রাষ্ট্র সংশোধনী প্রকাশ করতে পারে, প্ল্যাটফর্মগুলোকে আধেয়তে লেবেল লাগাতে বা তার বিস্তার কমাতে বাধ্য করতে পারে এবং স্বাধীন ফ্যাক্ট-চেকিংয়ে অর্থায়ন করতে পারে। পোমেরানজ এবং শুইড (২০২১) উপসংহার টেনেছেন যে অভিব্যক্তির সুরক্ষা, সঠিক তথ্য প্রচার, হুইসেলব্লোয়ারদের সুরক্ষা এবং স্বাধীন গণমাধ্যমকে সহায়তা করার মাধ্যমেই জনস্বাস্থ্য সবচেয়ে ভালোভাবে সুরক্ষিত হয়, এবং সরকার যখন অনিশ্চয়তা তৈরি করে ও অধিকার লঙ্ঘন করে তখন তারা জনস্বাস্থ্যকে ক্ষতিগ্রস্ত করে। মারেকোস ও তার সহকর্মীরা (২০২৩) একইভাবে দেখেছেন যে স্বাস্থ্য-সংক্রান্ত ভুল তথ্যের বাক্-সংকোচনমূলক সমাধানগুলো গুরুতর সাংবিধানিক ও নৈতিক সীমার মুখোমুখি হয় এবং তারা গণমাধ্যম সাক্ষরতা, ফ্যাক্ট-চেকিং ও বিশ্বাসযোগ্যতার সংকেতের পক্ষে মত দেন। আনানসারিংকার্ন এবং নিও (২০২১) থাইল্যান্ড নিয়ে গবেষণা করতে গিয়ে যুক্তি দিয়েছেন যে ভুয়া সংবাদকে বেআইনি কাজের সমতুল্য করা ব্যক্তিস্বাধীনতাকে ক্ষুণ্ণ করে এবং তারা সর্বাগ্রে প্রযুক্তি কোম্পানিগুলোর ওপর স্বচ্ছতার বাধ্যবাধকতা আরোপের সুপারিশ করেন।

৪.৬ কারাদণ্ড তথ্যগত সমস্যার সমাধান করে না

একক বক্তাদের কারাদণ্ড দিলে ব্যাপক মাত্রায় ভুল তথ্য হ্রাস পায়, এমন প্রমাণ খুব সামান্যই আছে। বড় আকারের অপতথ্য প্রধানত সমন্বিত নেটওয়ার্ক, বাণিজ্যিক তৎপরতা এবং প্রায়শই খোদ রাষ্ট্রগুলোর দ্বারাই উৎপাদিত হয়। পোমেরানজ এবং শুইড (২০২১) সরকারগুলোর নিজেদের মিথ্যা তথ্য প্রচার করাকে কোভিড-১৯ মোকাবিলার একটি স্বতন্ত্র বর্গ হিসেবে তালিকাভুক্ত করেছেন। ফৌজদারি ভুয়া-সংবাদ আইনগুলো সরকারগুলোর নিজেদের মিথ্যাচারের বিরুদ্ধে প্রায় কখনোই ব্যবহৃত হয় না। এগুলো ব্যবহৃত হয় নেটওয়ার্কের প্রান্তে থাকা একক ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে: একজন ডেনীয় পর্যটক, একজন কাউন্সিলর, একজন কার্টুনিস্ট, একজন স্থানীয় সাংবাদিক। কারাদণ্ড সমালোচককে সরিয়ে দেয় কিন্তু মিথ্যাচারকে বাজারে চালু রাখে।

৫. মানহানি ও ভুল তথ্যের জন্য কেবল-জরিমানা মডেল

ক্ষতিকর অসত্যতার কিছুটা নিয়ন্ত্রণ বৈধ, এ কথা মেনে নিয়ে প্রস্তাবটি হলো অসত্যতা, মানহানি বা "ভুল তথ্য"-এর যেকোনো অভিব্যক্তি-ভিত্তিক অপরাধের সর্বোচ্চ শাস্তি হওয়া উচিত দেওয়ানি বা প্রশাসনিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে আরোপিত আর্থিক জরিমানা, যেখানে কোনো ফৌজদারি রেকর্ড এবং হাজতবাসের কোনো সম্ভাবনা থাকবে না। মডেলটির উপাদানগুলো নিচে দেওয়া হলো।

শাস্তির কাঠামো

১. **কখনোই কোনো কারাদণ্ড নয়, এমনকি জরিমানা অনাদায়েও নয়।** ইতিহাস দেখায় যে বক্তা যখন অর্থ পরিশোধ করতে পারেন না তখন জরিমানা কারাবাসে রূপ নেয়: ১৭৯৮ সালে ম্যাথিউ লায়ন জরিমানা পরিশোধ না হওয়া পর্যন্ত কারাগারে ছিলেন এবং মালয়েশিয়ায় ডেনীয় বিবাদীকে একই কারণে এক মাসের কারাদণ্ডের মুখোমুখি হতে হয়েছিল। অপরিশোধিত জরিমানা কেবল দেওয়ানি ঋণ হিসেবেই আদায়যোগ্য হওয়া উচিত।

২. **আয়-অনুপাতে নির্ধারিত এবং সর্বোচ্চ সীমাযুক্ত জরিমানা।** একটি নির্দিষ্ট অঙ্কের জরিমানা একজন ধনী কুশীলবের (actor) কাছে তুচ্ছ কিন্তু একজন শিক্ষার্থী বা ফ্রিল্যান্স সাংবাদিকের জন্য সর্বনাশা। একটি দৈনিক-আয়ভিত্তিক জরিমানা (day-fine) মডেল (নির্দিষ্ট কয়েক দিনের আয়ের সমপরিমাণ জরিমানা, যেখানে ব্যক্তিদের জন্য একটি কঠোর সর্বোচ্চ সীমা থাকবে) নিবৃত্তিমূলক ব্যবস্থাকে আনুপাতিক রাখে এবং জরিমানাকে সমালোচকদের ধ্বংস করার পেছনের দরজার হাতিয়ারে পরিণত হওয়া থেকে বিরত রাখে।

৩. **সংগঠন ও সমন্বিত তৎপরতার জন্য উচ্চতর ও পৃথক জরিমানা।** বাণিজ্যিক অপতথ্য সেবা, বট নেটওয়ার্ক এবং স্বচ্ছতার দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ প্ল্যাটফর্মগুলো বড় আকারের প্রশাসনিক জরিমানার মুখোমুখি হতে পারে, যা সবচেয়ে ভারী বোঝাটি একক বক্তার পরিবর্তে ব্যাপক মাত্রার কুশীলবদের ওপর রাখে।

বিচারিক প্রক্রিয়া

১. **কোনো গ্রেপ্তার, আটক বা ডিভাইস জব্দ নয়,** এসব ভিত্তির ওপর পরিচালিত যেকোনো কার্যধারায় (proceedings)। কার্যধারা শুরু হবে লিখিত নোটিশের মাধ্যমে।

২. **যেকোনো শাস্তির আগে সংশোধন এবং জবাব দেওয়ার অধিকার।** প্রথম প্রতিকার হওয়া উচিত একটি প্রকাশিত সংশোধনী বা জবাব, যা সরাসরি ক্ষতিটিকে মোকাবিলা করে। কেবল তখনই জরিমানা হওয়া উচিত যদি এমন কোনো বক্তা তা সংশোধন করতে অস্বীকার করেন যিনি জানতেন যে বক্তব্যটি মিথ্যা।

৩. **অসত্যতা, অবগতি এবং ক্ষতি প্রমাণের দায়ভার (burden of proof) রাষ্ট্র বা দাবিদারের ওপর।** মতামত, ব্যঙ্গ (satire)-বিদ্রূপ এবং সরল বিশ্বাসে জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে প্রদত্ত বক্তব্য সুরক্ষিত থাকবে। তেও এবং কিউ (২০২১) দেখিয়েছেন এই প্রমাণের দায়ভার কোথায় রাখা হচ্ছে তার ওপর কত কিছু নির্ভর করে।

৪. **একজন স্বাধীন নিষ্পত্তিকারী।** অসত্যতা সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত কোনো স্বাধীন আদালত বা ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক গৃহীত হওয়া উচিত, কখনোই এমন কোনো মন্ত্রী বা সংস্থার দ্বারা নয় যারা সেই সরকারের কাছে জবাবদিহি করে যাদের আচরণ নিয়ে আলোচনা চলছে।

৫. **কোনো বেসরকারি ফৌজদারি অভিযোগ নয়।** মানহানির দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিরা তাদের দেওয়ানি দাবি বজায় রাখবেন; তারা জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অন্যের বক্তব্যের জন্য রাষ্ট্রীয় আইন প্রয়োগ সচল করতে পারবেন না।

বিচ্যুতির বিরুদ্ধে সুরক্ষাকবচ

১. **সংবিধানে বা বিশেষ সংখ্যাগরিষ্ঠতা (supermajority)-নির্ভর আইনে সংবিধিবদ্ধ সর্বোচ্চ সীমা।** যেহেতু ঝুঁকিটি হলো ভবিষ্যতের কোনো সরকার শাস্তির মাত্রা বাড়িয়ে দিতে পারে, তাই কারাদণ্ড-না-থাকার নিয়মটিকে সাধারণ সংশোধনীর বিরুদ্ধে সুরক্ষিত করা উচিত।

২. **স্বচ্ছতা প্রতিবেদন (transparency report)।** প্রতিটি কার্যধারা, বক্তার পেশা, অভিযোগকারী সরকারি কর্মকর্তা হলে তার পরিচয় এবং ফলাফলের বার্ষিক প্রকাশনা, যাতে সাংবাদিক ও বিরোধী ব্যক্তিত্বদের বিরুদ্ধে অপব্যবহার দৃশ্যমান হয়।

৩. **মেয়াদোত্তীর্ণের বিধান (sunset clause) ও পর্যালোচনার ধারা,** যেকোনো জরুরি বাক্-সংক্রান্ত ব্যবস্থার ওপর, যেমনটি হাঙ্গেরির বিরোধী দল ২০২০ সালে চেয়েও ব্যর্থ হয়েছিল।

কোন বিষয়গুলো ফৌজদারি অপরাধ হিসেবেই থাকবে

এই মডেলটি প্রকৃত হুমকি, আসন্ন সহিংসতায় উসকানি, প্রতারণা, চাঁদাবাজি, মিথ্যা সাক্ষ্য, আর্থিক লাভের জন্য ছদ্মবেশ ধারণ এবং যৌন নির্যাতনমূলক চিত্রাবলি সংক্রান্ত ফৌজদারি আইনকে অক্ষুণ্ণ রাখে। সেসব অপরাধ সংজ্ঞায়িত হয় কোনো কাজ বা আসন্ন ক্ষতির দ্বারা, জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট কোনো বিতর্কিত দাবির দ্বারা নয়। যেখানে কোনো মিথ্যা বিবৃতি এ ধরনের অপরাধের একটি উপাদান (উদাহরণস্বরূপ, পুলিশকে মিথ্যা জরুরি সংবাদ দেওয়া, অথবা প্রতারণামূলক বিনিয়োগের প্রলোভন), সেখানে প্রসিকিউটরদের মূল অপরাধের অধীনেই অভিযোগ আনা উচিত। যে আচরণ অন্য কারণে ইতোমধ্যে ফৌজদারি অপরাধ, তা ফৌজদারি অপরাধই থাকবে; এই মডেল কেবল কারাদণ্ডের স্বাধীন ভিত্তি হিসেবে "অসত্যতা" এবং "সুনাম"-কে সরিয়ে দেয়।

৫.১ বাংলাদেশের প্রস্তাবিত সাইবার সুরক্ষা (সংশোধন) আইন, ২০২৭: সমস্যা ও করণীয়

এই প্রতিবেদনের আগের খসড়ায় সাইবার সুরক্ষা আইন, ২০২৬ (২০২৬ সনের ৮১ নং আইন)-এর প্রস্তাবিত সংশোধনীর কোনো আলোচনা ছিল না, এবং এর ধর্মীয় অংশটিও বাদ পড়েছিল। এই অংশে সেই ঘাটতি পূরণ করা হলো। বিশ্লেষণের ভিত্তি হলো "সাইবার সুরক্ষা আইন, ২০২৬-এর প্রস্তাবিত সংশোধনী" শিরোনামের তুলনামূলক বিবরণী (৯ নভেম্বর ২০২৬ তারিখের মতামতবিহীন সংস্করণ), যেখানে বর্তমান আইন ও প্রস্তাবিত "সাইবার সুরক্ষা (সংশোধন) আইন-২০২৭" পাশাপাশি দেখানো হয়েছে। খসড়াটি এখনো চূড়ান্ত নয়, তাই সংসদে ওঠার আগে এর ভাষা বদলাতে পারে। নিচে প্রতিটি সমস্যা আলাদাভাবে দেওয়া হলো, সঙ্গে কী করা উচিত এবং কী করা উচিত নয় তার প্রস্তাব।

ক. ধর্মীয় অংশ: নাম ছাড়া একটি কার্যকর ব্লাসফেমি বিধান (ধারা ২৬, ২৬ক ও ৮(২)(খ))

সমস্যা। খসড়ার কোথাও নবী মুহাম্মদ বা অন্য কোনো ধর্মীয় ব্যক্তিত্বকে "অবমাননা" করার কথা সরাসরি লেখা নেই। তবু তিনটি বিধান একসঙ্গে পড়লে কার্যত একটি ব্লাসফেমি আইন দাঁড়ায়, যার প্রধান ঝুঁকিতে থাকবেন নাস্তিক, সংশয়বাদী ও ধর্মের সমালোচকেরা।

প্রথমত, বর্তমান ধারা ২৬(১) এমন যেকোনো প্রকাশকে অপরাধ ধরে যা "ধর্মীয় বা সাম্প্রদায়িক ঘৃণামূলক" এবং যা সহিংসতা তৈরি করে "বা উদ্বেগ সৃষ্টি করে"। "উদ্বেগ" এত নিচু মানদণ্ড যে ধর্মের সমালোচনায় কেউ ক্ষুব্ধ হলেই শর্তটি পূরণ হয়ে যায়। আইনে ধর্মের ধারণা, গ্রন্থ বা ধর্মীয় ব্যক্তিত্বের সমালোচনা এবং কোনো জনগোষ্ঠীর মানুষের বিরুদ্ধে ঘৃণা ছড়ানোর মধ্যে কোনো পার্থক্য টানা হয়নি। ফলে নবীর জীবন বা আচরণ নিয়ে একটি সমালোচনামূলক লেখাকে অভিযোগকারী সহজেই "ধর্মীয় ঘৃণামূলক বক্তব্য" বলে দাবি করতে পারেন, এবং বিক্ষুব্ধ জনতার প্রতিক্রিয়াই হয়ে দাঁড়ায় "উদ্বেগ সৃষ্টি"র প্রমাণ।

দ্বিতীয়ত, খসড়া ধারা ২৬(২)-এর সর্বোচ্চ সাজা ২ বছর থেকে বাড়িয়ে ৫ বছর করছে, আর ধারা ৪৬(২) সংশোধন করে ২৬ ধারার অপরাধকে জামিনযোগ্য থেকে অজামিনযোগ্য করছে। ২০২৫ সালের অধ্যাদেশ বাক্-সংক্রান্ত অপরাধগুলো জামিনযোগ্য করেছিল; এই খসড়া সেই সংস্কার উল্টে দেয়। অনুচ্ছেদ ৩.২-এ বর্ণিত শাস্তির ঊর্ধ্বমুখী চাপের এটি একটি সরাসরি উদাহরণ।

তৃতীয়ত, নতুন ধারা ২৬ক "গুজব ও অপতথ্য" প্রচারের জন্য ৫ বছর পর্যন্ত কারাদণ্ড রাখছে এবং এটিও অজামিনযোগ্য। "গুজব"-এর সংজ্ঞার ব্যাখ্যায় উদাহরণ হিসেবে ধর্মীয় অনুভূতিকে উসকে দেওয়া একটি প্রচারকেই বেছে নেওয়া হয়েছে। এর ফলে ধর্মীয় বর্ণনা বা ঐতিহাসিক দাবির সত্যতা নিয়ে প্রশ্ন তোলাকেও "মিথ্যা বা বিকৃত তথ্য" বলে অভিযোগ আনার সুযোগ তৈরি হয়, এবং আদালতকে কার্যত ধর্মীয় সত্য নির্ধারণের ভূমিকায় বসানো হয়।

চতুর্থত, ধারা ৮(২)(খ) অনুযায়ী ধর্মীয় বা সাম্প্রদায়িক সহিংসতার কেবল "আশংকা" থাকলেই আইনশৃঙ্খলা বাহিনী, তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয় বা সরকারের ক্ষমতাপ্রাপ্ত যেকোনো সংস্থা কনটেন্ট সরাতে বা ব্লক করতে পারবে।

এই কাঠামো নতুন নয়। ২০১৩ সালের সংশোধিত আইসিটি আইনের ধারা ৫৭-তে "ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত" অপরাধ ছিল, এবং ২০১৩ সালেই আসিফ মহিউদ্দীন, মশিউর রহমান বিপ্লব, সুব্রত অধিকারী শুভ ও রাসেল পারভেজসহ কয়েকজন ব্লগারকে আইসিটি আইনের মামলায় গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। প্রস্তাবিত ২৬ ধারা সেই বিধানের কাজটিই করবে, শুধু "ধর্মীয় অনুভূতি" শব্দটি ব্যবহার না করে। জাতিসংঘ মানবাধিকার কমিটির সাধারণ মন্তব্য নং ৩৪-এর অনুচ্ছেদ ৪৮ অনুযায়ী ধর্ম বা বিশ্বাসের প্রতি অশ্রদ্ধা প্রকাশ নিষিদ্ধ করা, ব্লাসফেমি আইনসহ, আইসিসিপিআর-এর সঙ্গে অসামঞ্জস্যপূর্ণ, কেবল অনুচ্ছেদ ২০(২)-এর আওতায় সহিংসতা, শত্রুতা বা বৈষম্যে উসকানির ক্ষেত্র ছাড়া।

যা করা উচিত

২৬ ধারার আওতা সীমিত করা, যাতে কেবল সেই বক্তব্য অপরাধ হয় যা কোনো ধর্মীয় বা জাতিগত গোষ্ঠীর মানুষের বিরুদ্ধে সহিংসতা, শত্রুতা বা বৈষম্যে উসকানি দেয়, যেখানে উসকানির উদ্দেশ্য প্রমাণিত এবং আসন্ন ক্ষতির বাস্তব সম্ভাবনা আছে। জাতিসংঘের রাবাত কর্মপরিকল্পনার (২০১২) ছয়টি মানদণ্ড, অর্থাৎ প্রেক্ষাপট, বক্তার অবস্থান, উদ্দেশ্য, বিষয়বস্তু ও ধরন, প্রচারের ব্যাপ্তি এবং ক্ষতির সম্ভাবনা ও আসন্নতা, আইনের ভাষাতেই লিখে দেওয়া।

একটি স্পষ্ট সুরক্ষা ধারা যোগ করা: ধর্ম, ধর্মগ্রন্থ, নবী বা অন্য ধর্মীয় ব্যক্তিত্ব ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের সমালোচনা, ব্যঙ্গ, ঐতিহাসিক বা একাডেমিক বিশ্লেষণ, এবং ধর্মত্যাগ বা অবিশ্বাসের প্রকাশ এই আইনের অধীনে অপরাধ বলে গণ্য হবে না।

"উদ্বেগ সৃষ্টি" এবং "আশংকা" শব্দগুলো ২৬ ও ৮(২)(খ) ধারা থেকে বাদ দেওয়া।

যারা কোনো লেখার প্রতিক্রিয়ায় জনতাকে সহিংসতার জন্য সংগঠিত করে, ফৌজদারি দায় তাদের ওপর রাখা। মূল লেখকের দায় তাঁর নিজের বক্তব্যের মধ্যেই সীমিত থাকবে, অন্যের সহিংস প্রতিক্রিয়া তাঁর অপরাধের প্রমাণ হবে না।

উসকানির পর্যায়ে না পৌঁছানো ঘৃণামূলক বক্তব্যের ক্ষেত্রে এই অধ্যায়ের কেবল-জরিমানা মডেল প্রয়োগ করা।

যা করা উচিত নয়

আইনে "ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত", "ধর্ম অবমাননা", "কটূক্তি" বা নবী-রাসূল অবমাননার মতো কোনো শব্দ যোগ করা, কিংবা সংসদীয় আলোচনায় এমন সংশোধনী তোলা হলে তা গ্রহণ করা।

শ্রোতার ক্ষোভ, মিছিল বা অনলাইনে প্রতিবাদের পরিমাণকে অপরাধের প্রমাণ হিসেবে গ্রহণ করা।

২৬ ধারাকে অজামিনযোগ্য করা বা এর সাজা ৫ বছরে তোলা।

আদালত বা কোনো সরকারি সংস্থাকে ধর্মীয় দাবির সত্য-মিথ্যা নির্ধারণের দায়িত্ব দেওয়া।

খ. গুজব ও অপতথ্য (ধারা ২(কক), ২(জজ) ও নতুন ধারা ২৬ক)

সমস্যা। ২০২৫ সালের অধ্যাদেশ "মিথ্যা" ও "আক্রমণাত্মক" তথ্য প্রকাশের অপরাধ বাতিল করেছিল। খসড়া সেই শ্রেণির অপরাধ নতুন নামে ফিরিয়ে আনছে, এবার ৫ বছর পর্যন্ত কারাদণ্ড বা ১০ লক্ষ টাকা জরিমানাসহ এবং অজামিনযোগ্য হিসেবে। "অপতথ্য"-এর সংজ্ঞার ব্যাখ্যায় "রাষ্ট্রের ভাবমূর্তি ক্ষতিগ্রস্ত করা"কে ক্ষতির উপাদান হিসেবে দেখানো হয়েছে, যা ডিএসএ-র সমালোচিত "রাষ্ট্রের ভাবমূর্তি" ধারণাটিকে ফিরিয়ে আনে। কোনটি মিথ্যা, সেই সিদ্ধান্তের প্রথম ধাপ থাকে পুলিশ ও মন্ত্রণালয়ের হাতে। অধ্যায় ২.৮-এ দেখানো মালয়েশিয়া, রাশিয়া ও তুরস্কের অভিজ্ঞতা বলে, এ ধরনের বিধান সবচেয়ে বেশি ব্যবহার হয় সাংবাদিক ও সরকার-সমালোচকদের বিরুদ্ধে।

যা করা উচিত। প্রথম প্রতিকার হিসেবে সংশোধনী প্রকাশের নির্দেশ; জেনেশুনে মিথ্যা প্রচার, সংশোধনে অস্বীকৃতি এবং বাস্তব ক্ষতি তিনটিই প্রমাণিত হলে কেবল আয়-অনুপাতে জরিমানা; স্বাধীন ট্রাইব্যুনালে নিষ্পত্তি; সরল বিশ্বাসে প্রকাশিত ও পরে সংশোধিত তথ্যের জন্য স্পষ্ট অব্যাহতি। "রাষ্ট্রের ভাবমূর্তি" ধরনের শব্দ সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা থেকে বাদ দেওয়া।

যা করা উচিত নয়। কারাদণ্ড বা অজামিনযোগ্যতা রাখা; সরকারি বিবৃতির সঙ্গে না মেলাকে মিথ্যার প্রমাণ ধরা; ক্ষতির "আশংকা"কে শাস্তির ভিত্তি করা।

গ. সাইবার মানহানি (নতুন ধারা ২৫ক)

সমস্যা। ২০২৫ সালের অধ্যাদেশ প্রকাশনার মাধ্যমে মানহানির অপরাধ বাতিল করেছিল, কারণ সাংবাদিকদের বিরুদ্ধে এটিই সবচেয়ে বেশি ব্যবহার হতো। খসড়া ২৫ক ধারায় তা আবার যোগ করছে, ২ বছর পর্যন্ত কারাদণ্ড বা ৫ লক্ষ টাকা জরিমানাসহ। দণ্ডবিধির ৪৯৯ ও ৫০০ ধারায় ফৌজদারি মানহানি আগে থেকেই আছে, ফলে একই বক্তব্যের জন্য দুটি আলাদা ফৌজদারি পথ খুলে যায়।

যা করা উচিত। মানহানিকে দেওয়ানি প্রতিকারে সীমিত রাখা; বড়জোর সত্য, মতামত ও জনস্বার্থের প্রতিরক্ষাসহ জরিমানা; অভিযোগ দায়েরের অধিকার কেবল সরাসরি সংক্ষুব্ধ ব্যক্তির।

যা করা উচিত নয়। কারাদণ্ড রাখা; দণ্ডবিধির পাশাপাশি দ্বিতীয় একটি ফৌজদারি মানহানি অপরাধ তৈরি করা; তৃতীয় পক্ষকে অন্যের পক্ষে মামলা করতে দেওয়া।

ঘ. হেয়প্রতিপন্ন করা ও বুলিং (ধারা ২(ড়ড়), ২(ফফ) ও নতুন ধারা ২৫খ)

সমস্যা। "হেয়প্রতিপন্ন"-এর সংজ্ঞায় তাচ্ছিল্য, উপহাস বা অবজ্ঞার উদ্দেশ্যে আত্মসম্মানে আঘাতকে অপরাধ ধরা হয়েছে, এবং ব্যাখ্যায় ছবি বা ভিডিও সম্পাদনা করে ব্যঙ্গচিত্র বা মিম তৈরির কথা স্পষ্টভাবে আছে। শাস্তি ৩ বছর পর্যন্ত কারাদণ্ড, অপরাধটি অজামিনযোগ্য। সংজ্ঞায় "গঠনমূলক সমালোচনার সীমা অতিক্রম" কথাটি আছে, কিন্তু কোন সমালোচনা গঠনমূলক তা কে ঠিক করবে বলা নেই। এই বিধান রাজনৈতিক কার্টুন, ব্যঙ্গ ও প্যারোডিকে সরাসরি ঝুঁকিতে ফেলে; ডিএসএ-র অধীনে কার্টুনিস্ট আহমেদ কবির কিশোরের মামলা এর পূর্বাভাস। ধর্মীয় ব্যক্তিত্বকে নিয়ে ব্যঙ্গও এই ধারায় আনা যাবে।

যা করা উচিত। হয়রানি ও বুলিং থেকে ব্যক্তিগত মানুষকে রক্ষার একটি সংকীর্ণ বিধান রাখা, যেখানে আচরণটি পুনরাবৃত্ত, নির্দিষ্ট ব্যক্তিকে লক্ষ্য করে এবং ক্ষমতার ভারসাম্যহীনতা থেকে আসে; প্রতিকার হবে সুরক্ষা আদেশ ও জরিমানা। সরকারি কর্মকর্তা, জনপরিচিত ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান ও ধর্মীয় ব্যক্তিত্ব নিয়ে ব্যঙ্গ, প্যারোডি ও কার্টুনকে স্পষ্টভাবে অব্যাহতি দেওয়া।

যা করা উচিত নয়। উপহাস বা বিদ্রূপকে ফৌজদারি অপরাধ করা; কর্মকর্তাদের সমালোচনা থামাতে এই ধারা ব্যবহারের সুযোগ রাখা।

ঙ. কনটেন্ট অপসারণ ও ব্লকের ক্ষমতা (ধারা ৮(২), ৮(৩) ও ৮(৪))

সমস্যা। খসড়া ব্লকের ক্ষমতা আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর বাইরে তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয় এবং সরকারের ক্ষমতাপ্রাপ্ত যেকোনো সংস্থার হাতে দিচ্ছে। কারণের তালিকায় যুক্ত হচ্ছে দেশের "মর্যাদা", মানহানি ও হেয়প্রতিপন্ন করা, এবং প্রতিটি কারণের সঙ্গে "আশংকা থাকে" শব্দবন্ধ। বর্তমান আইনে ব্লকের ৩ দিনের মধ্যে ট্রাইব্যুনালের অনুমতি নিতে হয় এবং না পেলে কনটেন্ট আবার উন্মুক্ত করতে হয়; খসড়া এই বিচারিক তদারকি তুলে দিয়ে সংক্ষুব্ধ ব্যক্তিকে সেই সংস্থার কাছেই আপিল করতে বলছে। ব্লক হওয়া সব কনটেন্টের তালিকা জনসম্মুখে প্রকাশের বাধ্যবাধকতাও বাদ দেওয়া হয়েছে।

যা করা উচিত। ৩ দিনের মধ্যে ট্রাইব্যুনালের অনুমোদন ও অনুমোদন না পেলে স্বয়ংক্রিয় পুনর্বহালের বিধান রাখা; ব্লক হওয়া কনটেন্টের প্রকাশ্য রেজিস্টার রাখা; আপিল যাবে স্বাধীন ট্রাইব্যুনালে।

যা করা উচিত নয়। তথ্য মন্ত্রণালয়কে নিজের বা সরকারের সমালোচনা ব্লক করার ক্ষমতা দেওয়া; "মর্যাদা" বা "আশংকা"-র মতো অনির্দিষ্ট ভিত্তি রাখা।

চ. অজামিনযোগ্যতা, গ্রেপ্তার এবং কেবল নিবন্ধিত সংবাদমাধ্যমের সুরক্ষা (ধারা ৪৬ ও নতুন ধারা ৪৬ক)

সমস্যা। খসড়া অনুযায়ী ২৫, ২৫খ, ২৬ ও ২৬ক ধারার অপরাধ অজামিনযোগ্য হবে। নতুন ৪৬ক ধারা গ্রেপ্তারের আগে ট্রাইব্যুনালের পূর্বানুমতি বাধ্যতামূলক করছে, কিন্তু কেবল নিবন্ধিত সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত কনটেন্টের ক্ষেত্রে। ব্লগার, ইউটিউবার, ফেসবুক লেখক, স্বাধীন লেখক ও প্রবাসী সমালোচকেরা এই সুরক্ষা পাবেন না, অথচ ধর্ম ও রাজনীতির সবচেয়ে কঠোর সমালোচনা সাধারণত তাঁদের কাছ থেকেই আসে। এতে বাক্‌স্বাধীনতা একটি লাইসেন্সনির্ভর সুবিধায় পরিণত হয়। মুশতাক আহমেদের মৃত্যু (অনুচ্ছেদ ২.৭) দেখায় অজামিনযোগ্য বাক্-অপরাধের পরিণতি কতদূর যেতে পারে।

যা করা উচিত। কোনো বাক্-অপরাধে গ্রেপ্তার না করা এবং লিখিত নোটিশে কার্যধারা শুরু করা; যতদিন তা না হয়, অন্তত ৪৬ক-র পূর্বানুমতির সুরক্ষা সব ব্যক্তির জন্য প্রসারিত করা।

যা করা উচিত নয়। নিবন্ধন বা লাইসেন্সের ভিত্তিতে নাগরিকদের দুই শ্রেণিতে ভাগ করা; বাক্-অপরাধকে অজামিনযোগ্য রাখা।

ছ. সংবাদমাধ্যম প্রতিষ্ঠানের নিবন্ধন ও লাইসেন্স বাতিল (ধারা ২৯(৩))

সমস্যা। কোনো কোম্পানি দোষী সাব্যস্ত হলে আদালত তার নিবন্ধন, লাইসেন্স বা কার্যক্রম স্থগিত বা বাতিল করতে পারবে, এবং নিবন্ধিত সংবাদমাধ্যমও এর আওতায় পড়ে। ১৫ দিনের নোটিশের শর্ত থাকলেও একটি বক্তব্যের জন্য পুরো প্রতিষ্ঠান বন্ধ করে দেওয়ার পথ খুলে যায়, যার শাস্তি ভোগ করবেন সব কর্মী ও পাঠক।

যা করা উচিত। প্রতিষ্ঠানের জন্য আনুপাতিক জরিমানা ও সংশোধনী প্রকাশের নির্দেশ।

যা করা উচিত নয়। বাক্-সংক্রান্ত অপরাধে সংবাদমাধ্যম বন্ধ বা লাইসেন্স বাতিলের বিধান রাখা।

জ. কাউন্সিলের গঠন, তদারকি ও কর্মকর্তাদের দায়মুক্তি (ধারা ১২, ১৪ ও নতুন ধারা ৫২)

সমস্যা। জাতীয় সাইবার সুরক্ষা কাউন্সিল থেকে জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যানকে বাদ দেওয়া হচ্ছে, অথচ স্বরাষ্ট্র, পররাষ্ট্র এবং তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী যুক্ত হচ্ছেন। কাউন্সিলের সভা প্রতি ৩ মাসের বদলে ৬ মাসে একবার হবে। নতুন ৫২ ধারা কাউন্সিলের সদস্য ও আইনের অধীনে কাজ করা সব কর্মকর্তাকে "সরল বিশ্বাসে" করা কাজের জন্য দেওয়ানি ও ফৌজদারি মামলা থেকে দায়মুক্তি (immunity) দিচ্ছে। ক্ষমতা বাড়ছে, কিন্তু তদারকি ও জবাবদিহি কমছে।

যা করা উচিত। মানবাধিকার কমিশনকে কাউন্সিলে ফিরিয়ে আনা এবং সাংবাদিক ও নাগরিক সমাজের স্বাধীন প্রতিনিধি যুক্ত করা; প্রতিটি মামলা, ব্লক ও অভিযোগকারীর পরিচয়সহ বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ; মিথ্যা বা হয়রানিমূলক অভিযোগকারীর জন্য জরিমানা।

যা করা উচিত নয়। আইনের অপব্যবহারকারী কর্মকর্তাদের ঢালাও দায়মুক্তি দেওয়া।

সামগ্রিক মূল্যায়ন। অধ্যায় ৩-এ বর্ণিত পাঁচটি প্রক্রিয়ার প্রায় সবগুলোই এই খসড়ায় দেখা যায়: অস্পষ্ট শব্দ ("উদ্বেগ", "আশংকা", "মর্যাদা", "হেয়প্রতিপন্ন"), শাস্তির ঊর্ধ্বমুখী চাপ (২ থেকে ৫ বছর, জামিনযোগ্য থেকে অজামিনযোগ্য), গ্রেপ্তার ও আটককে শাস্তি হিসেবে ব্যবহারের সুযোগ, বিচারিক তদারকির বদলে নির্বাহী নিয়ন্ত্রণ, এবং ২০২৫ সালে ভেঙে ফেলা কাঠামোর পুনর্নির্মাণ। যে সরকারই এখন খসড়াটি প্রস্তাব করুক, পাস হলে এই ক্ষমতা ভবিষ্যতের প্রতিটি সরকারের হাতে যাবে।

৬. পাল্টা যুক্তি ও প্রত্যুত্তর

একটি ন্যায্য মূল্যায়নের জন্য গবেষণালব্ধ সাহিত্যের সবচেয়ে শক্তিশালী আপত্তিগুলোর মুখোমুখি হওয়া প্রয়োজন।

৬.১ ফৌজদারি মানহানি প্রধানত সাধারণ মানুষকে রক্ষা করে

প্রিচার্ড (২০০৯) দেখেছেন যে উইসকনসিনের বেশিরভাগ ফৌজদারি মানহানির মামলার সাথে রাজনীতির কোনো সম্পর্ক ছিল না, বিরল রাজনৈতিক মামলাগুলোতে প্রথম সংশোধনী বিবাদীদের রক্ষা করেছিল, এবং তিনি উপসংহারে পৌঁছেন যে ফৌজদারি মানহানি বৈধভাবেই একক ব্যক্তিদের ক্ষতি মোকাবিলা করতে পারে। টেইলর এবং প্রিচার্ড (২০১৮) একইভাবে দেখেছেন যে কানাডার অনেক মামলায় সাবেক সঙ্গীদের বিরুদ্ধে যৌন অবমাননাকর কটূক্তি জড়িত ছিল। এ ধরনের নির্যাতনের ভুক্তভোগীদের প্রায়ই দেওয়ানি মামলা চালানোর সামর্থ্য থাকে না এবং বিবাদীও ক্ষতিপূরণ আদায়ের অযোগ্য হতে পারে।

প্রত্যুত্তর। এসব ক্ষেত্রে ক্ষতিগুলো বাস্তব, এবং সেগুলোকে হয়রানি, অন্তরঙ্গ-চিত্রের অপব্যবহার বা পিছু নেওয়া হিসেবে বর্ণনা করাই অধিকতর সংগত, যা আচরণের দ্বারা সংজ্ঞায়িত সুনির্দিষ্ট অপরাধ এবং সুরক্ষামূলক আদেশের মাধ্যমে মোকাবিলা করা যায়। কানাডার সেই একই গবেষণায় দেখা গেছে যে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক মামলা পুলিশ ও বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তাদের সমালোচনাকে লক্ষ্যবস্তু করেছিল, যা দেখায় কীভাবে একটি সাধারণ মানহানি অপরাধ কর্মকর্তাদের সুরক্ষার দিকে ঝুঁকে পড়ে। একটি সুনির্দিষ্টভাবে প্রণীত হয়রানি অপরাধ রাষ্ট্রকে সুনামের প্রশ্নে বক্তাদের কারাদণ্ড দেওয়ার সাধারণ ক্ষমতা না দিয়েই ব্যক্তিগত ভুক্তভোগীদের রক্ষা করে।

৬.২ মর্যাদা হিসেবে সুনাম ফৌজদারি সুরক্ষার দাবি রাখে

অ্যানস্টি (২০১৭) যুক্তি দেন যে বিলোপপন্থী সাহিত্যের একটি বড় অংশ সুনামকে সঠিকভাবে বিশ্লেষণ করতে ব্যর্থ হয়, এবং বহু আইনি সংস্কৃতিতে সুনাম সম্মান বা মর্যাদার কাছাকাছি একটি ব্যক্তিগত স্বার্থ, যা রাষ্ট্র বৈধভাবেই রক্ষা করতে পারে। ইউরোপ ও এশিয়ার বেশ কিছু ব্যবস্থা মানহানিকে প্রধানত এভাবেই দেখে, যা লাইব্রেরি অনুসন্ধানের ফলাফলে পোলিশ, সার্বীয় এবং ক্রোয়েশীয় বিতর্কগুলোতে প্রতিফলিত হয়েছে।

প্রত্যুত্তর। মর্যাদা রক্ষা করা প্রতিকারের যৌক্তিকতা হতে পারে, এবং কারাদণ্ড ছাড়াই সেই প্রতিকার অর্জন করা সম্ভব। দেওয়ানি ক্ষতিপূরণ, সংশোধনী, ক্ষমা প্রার্থনা এবং জরিমানা, সবই মর্যাদাকে সমুন্নত করে। প্রশ্নটি হলো কারাদণ্ডের মাধ্যমে অর্জিত বাড়তি সুরক্ষা কারাদণ্ডযোগ্য বাক্-অপরাধের প্রামাণ্য অপব্যবহারের চেয়ে বেশি ওজন বহন করে কি না, এবং ঐতিহাসিক রেকর্ড ইঙ্গিত দেয় যে তা করে না।

৬.৩ কিছু মিথ্যাচার প্রাণঘাতী

মামাক (২০২১) চিকিৎসা বিজ্ঞানের সুস্পষ্ট পরিপন্থী তথ্য জনসমক্ষে প্রচার করার বিরুদ্ধে একটি সংকীর্ণ পরিধির অপরাধের প্রস্তাব করেছেন, যা কেবল অ-ফৌজদারি ব্যবস্থা ব্যর্থ হলেই বিবেচনা করা হবে, এবং টিকাদানে দ্বিধাকে একটি প্রধান বৈশ্বিক স্বাস্থ্য হুমকি হিসেবে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার ঘোষণার দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করেছেন। প্রহাসাচিত্ত এবং হারক্রিসনোও (২০২৪) যুক্তি দেন যে ইন্দোনেশিয়ার ইতিহাস ও সামাজিক পরিস্থিতি নির্দিষ্ট সীমার ভেতর জনশৃঙ্খলা বিঘ্নিতকারী ভুয়া সংবাদকে অপরাধ হিসেবে ঘোষণা করার যৌক্তিকতা দিতে পারে। গুজব দ্বারা উসকে দেওয়া জাতিগত সহিংসতার মুখোমুখি সরকারগুলোও একই ধরনের যুক্তি দেয়।

প্রত্যুত্তর। যেখানে মিথ্যা বক্তব্য আসন্ন সহিংসতা ঘটানোর উদ্দেশ্যে এবং ঘটানোর সম্ভাবনা নিয়ে উচ্চারিত হয়, সেখানে তা উসকানি হিসেবে গণ্য হয় এবং এই মডেলের অধীনে ফৌজদারি অপরাধ হিসেবেই থাকে। চিকিৎসা সংক্রান্ত ভুল তথ্যের ক্ষেত্রে মামাক নিজেই অপরাধীকরণকে সর্বশেষ উপায় হিসেবে গণ্য করেছেন, এবং উপরে পর্যালোচিত জনস্বাস্থ্য সাহিত্য (পোমেরানজ ও শুইড, ২০২১; মারেকোস ও সহকর্মীরা, ২০২৩) সংশোধনী, স্বচ্ছতা এবং বিশ্বস্ত তথ্যকেই অধিকতর কার্যকর বলে নির্দেশ করে। তাছাড়া "চিকিৎসা বিজ্ঞানের সুস্পষ্ট পরিপন্থী" হলো ঠিক সেই ধরনের মানদণ্ড যা তখনই বিপজ্জনক হয়ে ওঠে যখন সরকার নিজেই আনুষ্ঠানিকভাবে চিকিৎসা বিজ্ঞান কী তা নিয়ন্ত্রণ করে, যেমনটি হাঙ্গেরির আতঙ্ক ছড়ানোর মামলাগুলো দেখিয়ে দেয়।

৬.৪ জরিমানা ক্ষমতাশালীদের নিবৃত্ত করে না, আবার জরিমানাও ভীতিজনিত নীরবতা তৈরি করতে পারে

একজন ধনী প্রচারক বা রাষ্ট্র-অর্থায়িত গণমাধ্যম জরিমানাকে ব্যবসা পরিচালনার খরচ হিসেবে ধরে নিতে পারে। বিপরীতক্রমে, বিশাল অঙ্কের দেওয়ানি ক্ষতিপূরণ এবং জনঅংশগ্রহণের বিরুদ্ধে কৌশলগত মামলা (স্ল্যাপ) ফৌজদারি বিচারের মতোই কার্যকরভাবে সাংবাদিকদের স্তব্ধ করে দিতে পারে।

প্রত্যুত্তর। জরিমানার সতর্ক নকশার মাধ্যমে উভয় বিষয়েরই উত্তর দেওয়া সম্ভব। আয়-অনুপাতে নির্ধারিত জরিমানা এবং উচ্চতর সাংগঠনিক জরিমানা সম্পদশালী কুশীলবদের নিবৃত্ত করার বিষয়টি নিশ্চিত করে, আর অ্যান্টি-স্ল্যাপ নিয়মাবলি, ক্ষতিপূরণের সর্বোচ্চ সীমা এবং মামলা খরচের সুরক্ষা সর্বনাশা দেওয়ানি দাবির ঝুঁকি মোকাবিলা করে। তাছাড়া কারাদণ্ডও প্রথম সমস্যাটির সমাধান করে না, কারণ ক্ষমতাশালী কুশীলবদের এসব আইনের অধীনে কদাচিৎ বিচারের মুখোমুখি করা হয়।

৬.৫ শক্তিশালী আদালতযুক্ত গণতন্ত্রের ওপর আস্থা রাখা যায়

প্রিচার্ড (২০০৯) দেখেছেন যে উইসকনসিনের রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত মামলাগুলোতে আদালত বিবাদীদের রক্ষা করেছিলেন, এবং তুরস্কের কোর্ট অব ক্যাসেশন ২১৭/এ ধারার প্রথম সাজাটি বাতিল করে দিয়েছিলেন। কেউ হয়তো উপসংহার টানতে পারেন যে সমাধান হলো ভালো বিচারক, লঘুতর শাস্তি নয়।

প্রত্যুত্তর। বিচারিক সংশোধন সাধারণত গ্রেপ্তার, আটক এবং বছরের পর বছর বিচারিক কার্যক্রমের পরে আসে, ফলে ততদিনে বক্তা বিচার প্রক্রিয়ার দ্বারাই শাস্তি ভোগ করে ফেলেন। তদুপরি, গণতান্ত্রিক পশ্চাদপসরণ (democratic backsliding) যে প্রতিষ্ঠানগুলোকে সবার আগে ক্ষয় করে, বিচার বিভাগের স্বাধীনতা সেগুলোর অন্যতম। দুই বিশ্বযুদ্ধের মধ্যবর্তী ব্রিটেন এবং ফ্যাসিস্ট ইতালির মধ্যে স্কিনারের (২০১৬) তুলনা একটি সতর্কবার্তা দেয় যে উভয় ধরনের ব্যবস্থাতেই আইনি হাতিয়ারগুলো হুবহু এক হতে পারে; পার্থক্য কেবল এই যে সেগুলো কারা নিয়ন্ত্রণ করছে।

৭. সংক্ষেপে প্রস্তাবিত পরিবর্তনসমূহ

অধ্যায় ৫.১-এর বিশ্লেষণের ভিত্তিতে প্রস্তাবিত সাইবার সুরক্ষা (সংশোধন) আইন-২০২৭-এর খসড়ায় আমরা যেসব পরিবর্তনের সুপারিশ করছি, সেগুলো নিচের সারণিতে ধারা অনুযায়ী সাজানো হলো। প্রথম কলামে ধারা নম্বর, দ্বিতীয় কলামে খসড়ায় যা প্রস্তাব করা হয়েছে, এবং তৃতীয় কলামে তার বদলে আমাদের প্রস্তাব। শেষ তিনটি সারিতে এমন বিধান আছে যা খসড়ায় নেই কিন্তু যোগ করা উচিত।

ধারা	প্রস্তাবিত খসড়ায় যা আছে	আমাদের প্রস্তাবিত পরিবর্তন
২(কক), ২(জজ)	“অপতথ্য” ও “গুজব”-এর নতুন সংজ্ঞা; ক্ষতির উদাহরণে “রাষ্ট্রের ভাবমূর্তি”	জেনেশুনে মিথ্যা প্রচার, সংশোধনে অস্বীকৃতি ও বাস্তব ক্ষতি, এই তিনটিকেই সংজ্ঞায় বাধ্যতামূলক করা; “ভাবমূর্তি” শব্দ বাদ দেওয়া
২(ড়ড়), ২(ফফ)	“হেয়প্রতিপন্ন” ও “বুলিং”-এর সংজ্ঞায় উপহাস, মিম ও সম্পাদিত ছবি অন্তর্ভুক্ত	“হেয়প্রতিপন্ন”-এর সংজ্ঞা বাদ; বুলিং-এর সংজ্ঞা পুনরাবৃত্ত ও নির্দিষ্ট ব্যক্তিকে লক্ষ্য করা হয়রানিতে (harassment) সীমিত; ব্যঙ্গ (satire), প্যারোডি ও কার্টুনকে অব্যাহতি
৮(২)	তথ্য মন্ত্রণালয়সহ যেকোনো ক্ষমতাপ্রাপ্ত সংস্থা “আশংকা”, “মর্যাদা”, মানহানি ও হেয়প্রতিপন্ন করার ভিত্তিতে কনটেন্ট ব্লক করতে পারবে	ব্লকের অনুরোধ কেবল আইনশৃঙ্খলা বাহিনী থেকে, ট্রাইব্যুনালের অনুমোদনসাপেক্ষে; “আশংকা”, “মর্যাদা”, মানহানি ও হেয়প্রতিপন্ন করা ব্লকের কারণ থেকে বাদ
৮(৩)	ব্লক হওয়া কনটেন্টের তালিকা জনসম্মুখে প্রকাশের বাধ্যবাধকতা বাদ	বাধ্যবাধকতা পুনর্বহাল; অনলাইনে একটি প্রকাশ্য রেজিস্টার
৮(৪)	৩ দিনের মধ্যে ট্রাইব্যুনালের অনুমোদন এবং না পেলে কনটেন্ট পুনর্বহালের বিধান বাদ; আপিল এজেন্সির কাছে	বর্তমান আইনের বিধান বহাল রাখা; আপিল যাবে স্বাধীন ট্রাইব্যুনালে
১২	কাউন্সিল থেকে জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যান বাদ; স্বরাষ্ট্র, পররাষ্ট্র এবং তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী যুক্ত	মানবাধিকার কমিশনকে ফিরিয়ে আনা; সাংবাদিক ও নাগরিক সমাজের স্বাধীন প্রতিনিধি যুক্ত করা
১৪(২)	কাউন্সিলের সভা ৩ মাসের বদলে ৬ মাসে একবার	প্রতি ৩ মাসে একবার সভার বিধান বহাল
২৫ক (নতুন)	সাইবার মানহানি: ২ বছর কারাদণ্ড বা ৫ লক্ষ টাকা জরিমানা	ধারাটি বাদ; দেওয়ানি প্রতিকার (civil remedy); বড়জোর সত্য, মতামত ও জনস্বার্থের প্রতিরক্ষাসহ জরিমানা
২৫খ (নতুন)	হেয়প্রতিপন্ন করা ও বুলিং: ৩ বছর কারাদণ্ড, অজামিনযোগ্য	কারাদণ্ড বাদ; সুরক্ষা আদেশ (protective order) ও আয়-অনুপাতে জরিমানা
২৬	ধর্মীয় ও জাতিগত বিদ্বেষমূলক প্রকাশ: সাজা ২ থেকে ৫ বছর, অজামিনযোগ্য; “উদ্বেগ সৃষ্টি” করাই যথেষ্ট	রাবাত কর্মপরিকল্পনার মানদণ্ড অনুযায়ী উসকানিতে (incitement) সীমিত; “উদ্বেগ” শব্দ বাদ; ধর্ম ও ধর্মীয় ব্যক্তিত্বের সমালোচনার জন্য সুরক্ষা ধারা; সহিংসতার সংগঠকদের দায়; উসকানির নিচের বক্তব্যে কেবল জরিমানা; জামিনযোগ্য
২৬ক (নতুন)	গুজব ও অপতথ্য: ৫ বছর কারাদণ্ড বা ১০ লক্ষ টাকা জরিমানা, অজামিনযোগ্য	কারাদণ্ড বাদ; প্রথম প্রতিকার সংশোধনী প্রকাশের নির্দেশ; এরপর স্বাধীন ট্রাইব্যুনালে আয়-অনুপাতে জরিমানা
২৯(৩)	সংবাদমাধ্যমসহ কোম্পানির নিবন্ধন, লাইসেন্স বা কার্যক্রম স্থগিত বা বাতিল	বাক্-সংক্রান্ত অপরাধে বাতিল বা স্থগিতের বিধান বাদ; আনুপাতিক জরিমানা
৪৬(১), ৪৬(২)	২৫খ, ২৬ ও ২৬ক ধারার অপরাধ অজামিনযোগ্য	২৫ক, ২৫খ, ২৬ ও ২৬ক জামিনযোগ্য ও অ-আমলযোগ্য (non-cognizable); গ্রেপ্তারের বদলে লিখিত নোটিশ
৪৬ক (নতুন)	গ্রেপ্তারের আগে ট্রাইব্যুনালের অনুমতি কেবল নিবন্ধিত সংবাদমাধ্যমের ক্ষেত্রে	এই সুরক্ষা ব্লগার, ইউটিউবার ও স্বাধীন লেখকসহ সব ব্যক্তির জন্য প্রসারিত
৫২ (নতুন)	কাউন্সিল ও কর্মকর্তাদের “সরল বিশ্বাসে” করা কাজের জন্য দেওয়ানি ও ফৌজদারি দায়মুক্তি	ধারাটি বাদ; অপব্যবহারের দায় বহাল; মিথ্যা বা হয়রানিমূলক অভিযোগকারীর জন্য জরিমানা
নতুন ধারা যোগ	নেই	ধর্ম, ধর্মগ্রন্থ ও ধর্মীয় ব্যক্তিত্বের সমালোচনা, ব্যঙ্গ, একাডেমিক বিশ্লেষণ এবং অবিশ্বাস প্রকাশকে অপরাধের আওতার বাইরে রাখার সুরক্ষা ধারা

ধারা	প্রস্তাবিত খসড়ায় যা আছে	আমাদের প্রস্তাবিত পরিবর্তন
নতুন ধারা যোগ	নেই	মানহানি, অপতথ্য বা হেয়প্রতিপন্ন করার মতো বাক্-সংক্রান্ত অপরাধে কারাদণ্ড নিষেধ, যা কেবল বিশেষ সংখ্যাগরিষ্ঠতায় (supermajority) সংশোধনযোগ্য
নতুন ধারা যোগ	নেই	প্রতিটি মামলা, ব্লক এবং সরকারি কর্মকর্তা অভিযোগকারী হলে তাঁর পরিচয়সহ বার্ষিক স্বচ্ছতা প্রতিবেদন (transparency report)

সারণি ২। প্রস্তাবিত সাইবার সুরক্ষা (সংশোধন) আইন-২০২৭-এর খসড়ায় সুপারিশকৃত পরিবর্তন। ধারা নম্বর ৯ নভেম্বর ২০২৬ তারিখের তুলনামূলক বিবরণী অনুযায়ী।

এই পরিবর্তনগুলোর মূল নীতি একটাই: মানহানি, অপতথ্য, হেয়প্রতিপন্ন করা বা ধর্মীয় সমালোচনার মতো বাক্-সংক্রান্ত বিষয়ে কাউকে গ্রেপ্তার, আটক বা কারাদণ্ড দেওয়া যাবে না। সহিংসতায় উসকানি, প্রকৃত হুমকি, ব্ল্যাকমেইল, যৌন হয়রানি ও শিশু যৌন নিপীড়নমূলক উপাদানের মতো অপরাধ আগের মতোই ফৌজদারি অপরাধ থাকবে, কারণ সেগুলো কোনো কাজ বা আসন্ন ক্ষতির দ্বারা সংজ্ঞায়িত।

৮. উপসংহার

১২৭৫ থেকে ২০২৬ সাল পর্যন্ত ঐতিহাসিক রেকর্ড দেখায় যে বাক্-অপরাধগুলো আপাতগ্রাহ্য লক্ষ্য (সুনাম, জনশৃঙ্খলা, জনস্বাস্থ্য, জাতীয় নিরাপত্তা রক্ষা) নিয়ে যাত্রা শুরু করে এবং বারংবার সমালোচকদের কারাবন্দি করার হাতিয়ারে পরিণত হয়। কঠোরতা বৃদ্ধি একটি সুনির্দিষ্ট পথ অনুসরণ করে: অস্পষ্ট পরিভাষা, ক্রমবর্ধমান শাস্তি, গ্রেপ্তার ও আটকের মাধ্যমে শাস্তি, ক্ষমতার মিত্রদের দ্বারা আইন প্রয়োগ, এবং আইন প্রণয়নকারী সরকারের পতনের পরও আইনটির টিকে থাকা। গণতন্ত্রও এ থেকে মুক্ত থাকেনি, এবং এক দলের লেখা আইন বারংবার তার প্রতিদ্বন্দ্বীদের দ্বারা ব্যবহৃত হয়েছে।

সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য সুরক্ষাকবচটি কাঠামোগত। যদি কোনো মানহানি, ভুয়া-সংবাদ বা ভুল তথ্য সংক্রান্ত অপরাধেই কারাদণ্ড বা ফেলনি মর্যাদা না থাকতে পারে, তবে ভবিষ্যতের কোনো সরকারই "মিথ্যা" ও "ক্ষতিকর" শব্দ দুটির যে ব্যাখ্যাই দিক না কেন, এ ধরনের আইন ব্যবহার করে কোনো সাংবাদিককে জেলে পাঠাতে, কোনো কর্মীকে জামিন ছাড়া আটকে রাখতে বা কোনো বিরোধী রাজনীতিককে জনজীবন থেকে সরিয়ে দিতে পারবে না। ক্ষতিকর অসত্যতার বিরুদ্ধে সমাজগুলোর হাতে তখনো কার্যকর হাতিয়ার থেকে যায়: সংশোধনী, দেওয়ানি প্রতিকার, স্বাধীন ফ্যাক্ট-চেকিং, প্ল্যাটফর্মের স্বচ্ছতা এবং আয়-অনুপাতে জরিমানা। হুমকি, উসকানি ও প্রতারণার জন্য ফৌজদারি আইনও তাদের হাতে বহাল থাকে। তারা কেবল একটি ক্ষমতাই পরিত্যাগ করে: কেউ কী বলেছে তার জন্য তাকে কারাপ্রকোষ্ঠে ঢোকানোর ক্ষমতা, যে ক্ষমতা রাখার বিষয়ে কোনো সরকারের ওপরই আস্থা রাখা উচিত নয় বলে ঐতিহাসিক রেকর্ড সাক্ষ্য দেয়।

তথ্যসূত্র

পিয়ার-রিভিউড প্রবন্ধসমূহ

Abcede, D., & Robie, D. (2015). Cybercrime, criminal libel and the media: From ‘e-martial law’ to the Magna Carta in the Philippines. *Pacific Journalism Review, 21*(1), 211–229. https://doi.org/10.24135/pjr.v21i1.158

Adibe, R., Ike, C. C., & Udeogu, C. U. (2017). Press freedom and Nigeria’s Cybercrime Act of 2015: An assessment. *Africa Spectrum, 52*(2), 117–127. https://doi.org/10.1177/000203971705200206

Anansaringkarn, P., & Neo, R. (2021). How can state regulations over the online sphere continue to respect the freedom of expression? A case study of contemporary ‘fake news’ regulations in Thailand. *Information & Communications Technology Law, 30*(3), 283–303. https://doi.org/10.1080/13600834.2020.1857789

Anstey, B. J. (2017). Criminal defamation and reputation as ‘honour’: A cross-jurisdictional perspective. *Journal of Media Law, 9*(1), 132–153. https://doi.org/10.1080/17577632.2017.1311467

Aryana, A. N., Akbar, M., Farid, M., & Sonni, A. F. (2026). Legal chilling effects in the algorithmic public sphere: A communicative framework for digital expression criminalization in emerging democracies. *Frontiers in Human Dynamics, 8*, 1831523. https://doi.org/10.3389/fhumd.2026.1831523

Bhowmik, S., & Fisher, J. (2026). Defensive journalism in Bangladesh: Consequences of the Digital Security Act on journalism practice. *Digital Journalism, 14*(1), 147–166. https://doi.org/10.1080/21670811.2024.2406861

Coenen, M. (2012). Of speech and sanctions: Toward a penalty-sensitive approach to the First Amendment. *Columbia Law Review, 112*(5), 991–1054.

Hunt, T. L. (2017). Servants, masters and seditious libel in eighteenth-century England. *Book History, 20*(1), 83–110. https://doi.org/10.1353/bh.2017.0002

Jenkins, D. (2001). The Sedition Act of 1798 and the incorporation of seditious libel into First Amendment jurisprudence. *American Journal of Legal History, 45*(2), 154–213. https://doi.org/10.2307/3185366

Kanstroom, D. (2020). [Review of the book *Criminal dissent: Prosecutions under the Alien and Sedition Acts of 1798*, by W. Bird]. *Journal of Interdisciplinary History, 51*(3), 480–482. https://doi.org/10.1162/jinh_r_01607

Lacy, M., & Mookherjee, N. (2020). ‘Firing cannons to kill mosquitoes’: Controlling ‘virtual streets’ and the ‘image of the state’ in Bangladesh. *Contributions to Indian Sociology, 54*(2), 280–305. https://doi.org/10.1177/0069966720917923

Leonard, Z. (2024). Libels, licenses, liberties: Conceptualising freedom of speech in colonial and postcolonial India. *Journal of Imperial and Commonwealth History, 52*(4–5), 569–599. https://doi.org/10.1080/03086534.2024.2344244

Lilienthal, G., & Ahmad, N. (2018). Sedition: A slippery slope argument devised to protect the state’s magnates. *Commonwealth Law Bulletin, 44*(4), 588–606. https://doi.org/10.1080/03050718.2019.1673199

Lisby, G. C. (2004). No place in the law: The ignominy of criminal libel in American jurisprudence. *Communication Law and Policy, 9*(4), 433–487. https://doi.org/10.1207/s15326926clp0904_4

Mamak, K. (2021). Do we need the criminalization of medical fake news? *Medicine, Health Care and Philosophy, 24*(2), 235–245. https://doi.org/10.1007/s11019-020-09996-7

Marecos, J., Shattock, E., Bartlett, O., Goiana-da-Silva, F., Maheswaran, H., Ashrafian, H., & Darzi, A. (2023). Health misinformation and freedom of expression: Considerations for policymakers. *Health Economics, Policy and Law, 18*(2), 204–217. https://doi.org/10.1017/S1744133122000263

Mayeux, S. (2021). [Review of the book *Criminal dissent: Prosecutions under the Alien and Sedition Acts of 1798*, by W. Bird]. *Journal of the Early Republic, 41*(1), 132–135. https://doi.org/10.1353/jer.2021.0010

Mittal, A. K. (2016). Implication of Shreya Singhal judgment on sedition law. *Statute Law Review, 37*(3), 273–278. https://doi.org/10.1093/slr/hmv041

Nelson, H. L. (1959). Seditious libel in colonial America. *American Journal of Legal History, 3*(2), 160–172. https://doi.org/10.2307/844283

Page, A. (2009). The Dean of St Asaph's trial: Libel and politics in the 1780s. *Journal for Eighteenth-Century Studies, 32*(1), 21–35. https://doi.org/10.1111/j.1754-0208.2008.00108.x

Pomeranz, J. L., & Schwid, A. R. (2021). Governmental actions to address COVID-19 misinformation. *Journal of Public Health Policy, 42*(2), 201–210. https://doi.org/10.1057/s41271-020-00270-x

Prahassacitta, V., & Harkrisnowo, H. (2024). The criminalization of fake news: Critique on Indonesia's new penal code. *Criminal Law Forum, 35*(1), 83–120. https://doi.org/10.1007/s10609-024-09478-y

Pritchard, D. (2009). Rethinking criminal libel: An empirical study. *Communication Law and Policy, 14*(3), 303–339. https://doi.org/10.1080/10811680903000989

Rakove, J. N. (2022). [Review of the book *Criminal dissent: Prosecutions under the Alien and Sedition Acts of 1798*, by W. Bird]. *American Historical Review, 126*(4), 1648–1649. https://doi.org/10.1093/ahr/rhab588

Rushton, P. (2015). The rise and fall of seditious words, 1650 to 1750. *Northern History, 52*(1), 68–84. https://doi.org/10.1179/0078172X14Z.00000000078

Shelton, D. (2015). Konaté v. Burkina Faso. *American Journal of International Law, 109*(3), 630–636. https://doi.org/10.5305/amerjintelaw.109.3.0630

Sherstoboeva, E. (2024). Russian bans on 'fake news' about the war in Ukraine: Conditional truth and unconditional loyalty. *International Communication Gazette, 86*(1), 36–54. https://doi.org/10.1177/17480485231220141

Skinner, S. (2016). Crimes against the state and the intersection of fascism and democracy in the 1920s–30s: Vilification, seditious libel and the limits of legality. *Oxford Journal of Legal Studies, 36*(3), 482–504. https://doi.org/10.1093/ojls/gqv034

Sonkar, A. (2026). Sedition recast: Analysing Section 150 of the BNS in light of the right to free speech. *Social Sciences & Humanities Open, 13*, 102276. https://doi.org/10.1016/j.ssaho.2025.102276

Spaic, A., Nolasco, C., & Novovic, M. (2016). Decriminalization of defamation: The Balkans case, a temporary remedy or a long term solution? *International Journal of Law, Crime and Justice, 47*, 21–30. https://doi.org/10.1016/j.ijlcj.2016.05.002

Stone, G. R. (2004). Free speech in World War II: "When are you going to indict the seditionists?" *International Journal of Constitutional Law, 2*(2), 334–367. https://doi.org/10.1093/icon/2.2.334

Taylor, L., & Pritchard, D. (2018). The process is the punishment: Criminal libel and political speech in Canada. *Communication Law and Policy, 23*(3), 243–266. https://doi.org/10.1080/10811680.2018.1467155

Teo, M. W. R., & Kiu, Y. Y. (2021). Burden of proof and false statements of fact under the Protection from Online Falsehoods and Manipulation Act 2019. *Singapore Academy of Law Journal, 33*(1), 760–776.

Vese, D. (2022). Governing fake news: The regulation of social media and the right to freedom of expression in the era of emergency. *European Journal of Risk Regulation, 13*(3), 477–513. https://doi.org/10.1017/err.2021.48

Yadav, V. (2023). The sedition conundrum in India: A critical examination of its historical evolution, current application and constitutional validity. *International Annals of Criminology, 61*(2), 1–35. https://doi.org/10.1017/cri.2023.19

Yücel, A. (2025). Hybrid digital authoritarianism in Turkey: The 'censorship law' and AI-generated disinformation strategy. *Turkish Studies, 26*(1), 1–27. https://doi.org/10.1080/14683849.2024.2392816

Zafarullah, H., & Nughat, S. (2026). Regulatory control and self-censorship in social media: Stifling freedom of expression in Bangladesh. *Journal of Asian and African Studies, 61*(6), 4733–4746. https://doi.org/10.1177/00219096261437744

আইনি দলিল ও আদালতের রায়সমূহ

UN Human Rights Committee. (2011). *General comment No. 34: Article 19, freedoms of opinion and expression* (CCPR/C/GC/34), paras. 47 and 48.

UN Office of the High Commissioner for Human Rights. (2012). Rabat Plan of Action on the prohibition of advocacy of national, racial or religious hatred that constitutes incitement to discrimination, hostility or violence (A/HRC/22/17/Add.4, appendix).

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ। (২০২৬)। সাইবার সুরক্ষা আইন, ২০২৬ (২০২৬ সনের ৮১ নং আইন)। বাংলাদেশ গেজেট, অতিরিক্ত সংখ্যা, ১০ এপ্রিল ২০২৬।

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ। (২০২৬)। সাইবার সুরক্ষা (সংশোধন) আইন, ২০২৬ (২০২৬ সনের ৯৯ নং আইন)। বাংলাদেশ গেজেট, অতিরিক্ত সংখ্যা, ১ জুলাই ২০২৬।

সাইবার সুরক্ষা আইন, ২০২৬-এর প্রস্তাবিত সংশোধনী: বর্তমান আইন ও প্রস্তাবিত সাইবার সুরক্ষা (সংশোধন) আইন-২০২৭-এর তুলনামূলক বিবরণী (মতামতবিহীন সংস্করণ, ৯ নভেম্বর ২০২৬)।

UN Human Rights Committee. (2011). *Adonis v. Philippines*, Communication No. 1815/2008.

African Court on Human and Peoples' Rights. (2014). *Lohe Issa Konaté v. Burkina Faso*, Application No. 004/2013.

Constitutional Court of Zimbabwe. (2014). *Madanhire and Another v. Attorney General*.

High Court of Kenya. (2017). *Jacqueline Okuta & another v. Attorney General & 2 others*, [2017] eKLR, Petition No. 397 of 2016.

Constitutional Court of Lesotho. (2018). *Peta v. Minister of Law, Constitutional Affairs and Human Rights*, CC 11/2016.

ECOWAS Community Court of Justice. (2022, March 25). *SERAP v. Federal Republic of Nigeria* (Cybercrime Act s.24).

Supreme Court of India. (2015). *Shreya Singhal v. Union of India*, (2015) 5 SCC 1; (2022). *S.G. Vombatkere v. Union of India* (interim order, 11 May 2022).

Supreme Court of the United States. (1919). *Debs v. United States*, 249 U.S. 211.

Constitutional Court of Hungary. (2020). Decision 15/2020 (VII. 8.) AB on Section 337(2) of the Criminal Code.

Singapore. Protection from Online Falsehoods and Manipulation Act 2019, s.7.

সাম্প্রতিক ঘটনাবলির প্রতিবেদন ও সংবাদ উৎস

Riaz, A. (2022). *The unending nightmare: Impacts of Bangladesh's Digital Security Act 2018*. Centre for Governance Studies. https://cgs-bd.com

International Commission of Jurists. (2013). *Bangladesh: Information and Communication Technology Act draconian assault on free expression*. https://www.icj.org

Riaz, A. (2021, December). How Bangladesh's Digital Security Act is creating a culture of fear. Carnegie Endowment for International Peace. https://carnegieendowment.org

The Daily Star; The Financial Express; bdnews24.com. (2025, May). Reporting on approval and gazetting of the Cyber Security Ordinance 2025.

Internet Freedom Foundation; Supreme Court Observer. (2021–2022). Reporting on continued registration of Section 66A cases and the Supreme Court's October 2022 order.

Reuters; AFP; ARTICLE 19. (2018). Reporting on Malaysia's Anti-Fake News Act, the first conviction and the repeal vote.

POFMA Office; Singapore Police Force. (2024–2026). Media statements on POFMA offences and the first Section 7 prosecution.

Bloomberg; Reporters Without Borders; IFJ. (2020). Reporting on Hungary's emergency scaremongering provision.

OVD-Info; Novaya Gazeta Europe; Euronews. (2022–2026). Reporting on prosecutions under Article 207.3 of the Russian Criminal Code.

bianet; International Press Institute; Committee to Protect Journalists; Stockholm Center for Freedom; European Federation of Journalists. (2023–2026). Reporting on prosecutions under Article 217/A of the Turkish Penal Code.

Dawn; Voice of America; Amnesty International. (2025). Reporting on the Prevention of Electronic Crimes (Amendment) Act 2025, Pakistan.

BenarNews; Al Jazeera; Reuters; Voice of America. (2020–2024). Reporting on the cyber-libel conviction and appeals of Maria Ressa and Reynaldo Santos Jr.

Southern Africa Litigation Centre; Columbia Global Freedom of Expression. (2017–2018). Case summaries of *Okuta* and *Peta*.

SERAP; Premium Times; Media Rights Agenda. (2022–2025). Reporting on the ECOWAS Court ruling and the Cybercrimes (Amendment) Act 2024.

National Archives; National Constitution Center; New England First Amendment Coalition. Historical summaries of the Debs prosecution and Sedition Act of 1798 prosecutions.